সংস্কৃতির তিন নকীব

মোশাররফ হোসেন খান

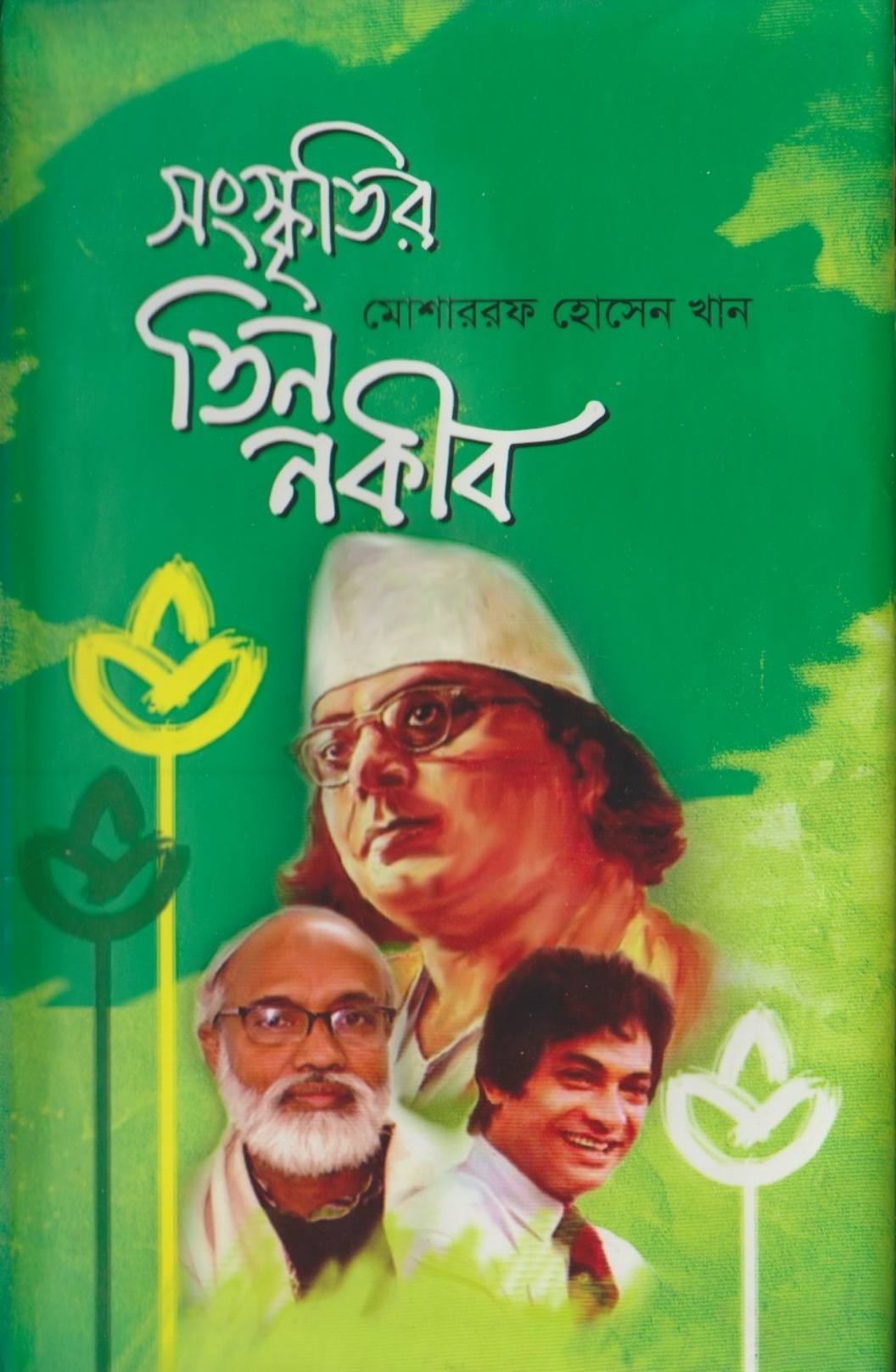

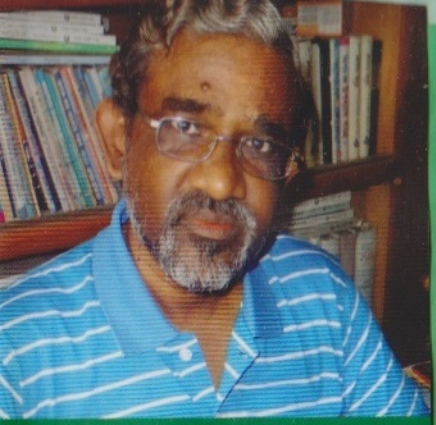

আধুনিক বাংলা কবিতায় মোশাররফ হোসেন খান একজন অন্যতম প্রধান কবি।

কবি মোশাররফ হোসেন খানের বিস্ময়কর উত্থান আমরা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছি। বাংলা সাহিত্যে ইতিমধ্যেই তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। কবিতায় তিনি বেগবান স্রোতের মত। দ্রোহ, প্রেম, জিজ্ঞাসা, রহস্য, দর্শন, আত্মসন্ধান, মানুষ, প্রকৃতি পৃথিবী ও মহাকাশ তাঁর কবিতায় সমুপস্থিত।

কবিতা ছাড়াও মোশাররফ হোসেন খান সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় বিচরণ করেন সম্রাটের মত। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, সাহিত্যের কলাম, শিশুসাহিত্য, জীবনী–কোনোটাই তাঁর আয়ত্তের বাইরে নয়। তিনি যখন যেটাই লেখেন–সেটাই হয়ে ওঠে সাহিত্যের একটি অনিবার্য পাঠ্য। বিষয়বৈচিত্র্য, ভাষা, টেকনিক–সব মিলিয়ে মোশাররফ হোসেন খানের হাতে আমাদের সাহিত্য পেয়েছে এক নতুন প্রাণ।

শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে কবিতার অনিবার্য পতন থেকে যারা মুক্তি দিয়েছেন, তাঁদের ভেতর অন্যতম মোশাররফ হোসেন খান। আজ তিনি আশির কবিদের শীর্ষে অবস্থান করছেন। সমালোচকদের দৃষ্টিতে–মোশাররফ হোসেন খান কেবল আশির দশকের শ্রেষ্ঠ কবি নন, সমগ্র বাংলা কবিতায় তিনি অত্যন্ত জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ এক কবি।

অপরিমেয় মেধাবী এই মৌলিক কবি জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৭ সালের ২৪শে আগস্ট, যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার অন্তর্গত কপোতাক্ষ নদের তীরে অবস্থিত বাঁকড়া গ্রামের একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারে। পিতা ডা. এম. এ ওয়াজেদ খান একজন কবি, শিক্ষানুরাগী এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী ছিলেন। মা–বেগম কুলসুম ওয়াজেদ। সাত ভাই-বোনের ভেতর তিনি দ্বিতীয়। বড় ভাই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী ও প্রাক্তন সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আবু সাঈদ। ছোট ভাইগুলোও উচ্চশিক্ষিত এবং অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত।

বাকি অংশ অপর ফ্ল্যাপে

www.pathagar.com

সংস্কৃতির তিন নকীব

মোশাররফ হোসেন খান

www.pathagar.com

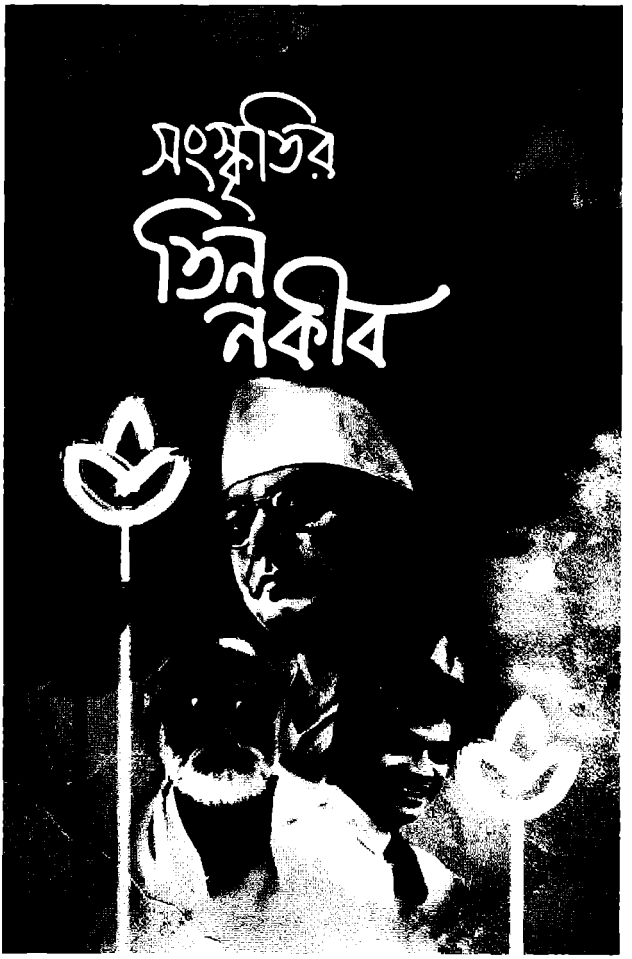

প্রকাশন

www.pathagar.com

সংস্কৃতির তিন নকীব

মোশাররফ হোসেন খান

প্রকাশক
পিদিম প্রকাশন
২২২, ফকিরাপুল, ১ম গলি, ৩য় তলা
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রকাশ কাল
অক্টোবর ২০১৬

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মোজাম্মেল প্রধান
ইষ্টিকুটুম /০১৬৭৪৭৯১৫৫৪

কম্পিউটার কম্পোজ
নাহিদ জিবরান

পরিবেশক
সাহিত্যকাল, পুরানা পল্টন, ঢাকা
প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা
আহসান পাবলিকেশন্স, মগবাজার ও কাটাবন

অনলাইন বুকশপ
www.rokomari.com

মূল্য: ১২০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

সূচিপত্র

কিশোর কাননে
কবি কাজী নজরুল ইসলাম | ০৭

কবি মতিউর রহমান মল্লিক
কাছের মানুষ আপনজন | ২০

রূপালি পর্দার সোনালি মানুষ
শেখ আবুল কাসেম মিঠুন | ৩৭

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

'সংস্কৃতি' একটি বিশাল অর্থবোধক শব্দ কারণ সংস্কৃতির রয়েছে বিভিন্ন ধরন-ধারণ, চালচিত্র ও প্রায়োগিক ভিন্নতা। একেক দেশের সংস্কৃতি একেক রকম। জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও তাই। আবার ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক দিক থেকেও যেমন ভিন্নতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে জাতি ও ধর্মেও। এই বিশালতার মধ্যে সংস্কৃতির প্রকৃত ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়া তাই একপ্রকার দুরূহ কাজ।

তবে আমরা ধর্মীয় দিক দিয়ে যদি এর বিশ্লেষণে যাই, তাহলে কিছুটা অবশ্য ঠাঁই পাওয়া সম্ভব। যেমন–এক এক জাতি ও ধর্মের মানুষের কাছে সংস্কৃতির স্বরূপ এক এক রকম।

অন্য ধর্মের সংস্কৃতির কথা এখানে উল্লেখ না করে কেবল আমাদের মুসলিম–তাও আবার ইসলামি সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে সামনে আগানো ভাল। সেই প্রেক্ষাপট থেকেই রচিত আমাদের সংস্কৃতি বিকাশের 'সংস্কৃতির তিন নকীব' গ্রন্থটি। বিশদভাবে নয়, কেবল মাত্র মৌল বিষয়কে সামনে রেখে সংক্ষিপ্ত আকারে স্পর্শ করার চেষ্টা মাত্র। এর মাধ্যমে অন্তত একটি পরিচয়পর্ব কিংবা আলোচনার সূত্র যেন তৈরি হতে পারে আগামীতে। প্রয়াসটা সেই চিন্তা থেকেই। আগামীতে ইনশাআল্লাহ আরও ব্যাপক আয়োজনের মাধ্যমে পাঠকের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা পূরণ হবে বলে আশা রাখি।

'পিদিম প্রকাশন' প্রকাশিত 'সংস্কৃতির তিন নকীব' পাঠকগ্রাহ্যতা পেলে অবশ্য আগামীতে বিশদভাবে এ নিয়ে কাজ করার সুযোগ তৈরি হবে। আমাদের জাতীয় সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে যাদের ত্যাগ, ভূমিকা ও অবদান রয়েছে, তাদের শ্রমকে অবশ্যই মূল্যায়নের দাবি রাখে। এখানে মাত্র তিন জন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরা হলো।

আগামীতেও সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

সকলের আন্তরিক দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি।

আল্লাহ হাফিজ।

মোশাররফ হোসেন খান

দক্ষিণ খিলগাঁও, ঢাকা

১৬.১০.২০১৬

www.pathagar.com

কিশোর কাননে
কবি কাজী নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

আমাদের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম জন্ম গ্রহণ করেন ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সালে। পশ্চিম বঙ্গের চুরুলিয়া গ্রামে। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে। কিন্তু পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। খুব অভাব দারিদ্র্যের মাধ্যমে তাঁদের পারিবারিক জীবন কাটতো। অনেক সময় না খেয়ে থাকতে হতো।

সেই দারিদ্র্যপীড়িত কবিই এখন আমাদের প্রাণের কবি। জাতীয় জাগরণের কবি। প্রতিদিনের স্মরণীয় কবি।

খুব ছোট্ট বেলায় তিনি কেমন ছিলেন?

ছিলেন বড্ড ডানপিটে। কারুর শাসন মানেন না। বারণ মানেন না। কাউকে ভয়ও করেন না। সবাই বলে 'বাউণ্ডেলে।'

পাড়ায় পাড়ায় গান গেয়ে বেড়ান। লেটোর দলে যোগ দেন। আবার মসজিদে আজান দেন। মক্তবে বাচ্চাদের পড়ান। সব মিলে সেই এক ক্ষ্যাপাটে ছেলে।

অত্যন্ত একরোখা ও ডানপিটে এই ছেলেটির হৃদয়ে সাহসের তুফান ছোটে। ধীরে ধীরে তিনি বড় হতে থাকেন। বড় হয়ে সৈনিকদের সাথে তিনিও যোগ দেন। দেশ ও জাতিকে ব্রিটিশের গোলামি থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করেন। এই চেষ্টায় এক সময় তাঁর হাতে কলম উঠে আসে। তাঁর কলমের সে কি ধার! সে কি কবিতা। কবিতাতো নয়, যেন সাহসের ফুলকি! তিনি লিখলেন 'বিদ্রোহী'র মতো এক কালজয়ী কবিতা। শুধু 'বিদ্রোহী'ই নয়,

www.pathagar.com

তাঁর শাণিত কলমে একে একে লেখেন অসংখ্য জাগরণমূলক কবিতা। এক সময় তাঁর হাতেই বেরিয়ে আসে 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশি', 'ভাঙার গান' প্রভৃতি অমর কাব্যগ্রন্থ। সৈনিক জীবন থেকে বেরিয়ে এসে তিনি সাহিত্য জীবনে প্রবেশ করলেন পুরোপুরিভাবে। সে কি লেখা! কবিতা, গান, গজল, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটকসহ সকল বিষয়ে তিনি দু'হাতে স্রোতের মতো লিখতে থাকলেন। যেন এক সাগরের বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়লো গোটা বাংলা সাহিত্যে। এমন তুমুল নাড়া মানুষ ও সাহিত্যের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, দেশ ও রাষ্ট্রের মধ্যে আর কেউ দিতে পারেননি। এজন্য তাঁকে অবশ্য বারবার ব্রিটিশের রোষানলেও পড়তে হয়েছে। করতে হয়েছে একের পর এক কারাবরণ। কিন্তু কোনো কিছুতেই থেমে যাননি এই দুঃসাহসী কলম সৈনিক কাজী নজরুল ইসলাম।

অসুস্থ হবার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত তিনি লিখে গেছেন। কোনো বাধাই তাঁকে স্তব্ধ করতে পারেনি। তাঁর লেখা মানেইতো এক মহা সাগরের উত্তাল তরঙ্গ!

বড়দের জন্য যেমন তিনি লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন ছোটদের জন্যও। প্রচুর লেখা। সেসব লেখার মধ্যে নজরুলের মৌলিক যে চারিত্র্য, সেটা ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে। যেমন তিনি লিখেছেন–

"থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে দেখবো এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন করে
কিসের নেশার করছে তারা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে।

পাতাল ফুঁড়ে নামবো আমি উঠবো আবার আকাশ ফুঁড়ে
বিশ্বজগৎ দেখবো আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।"

সবাই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে যায়। তিনি কেবল জেগে থাকেন। সবাই যখন বিছানায়, তিনি তখন বাইরে। তিনি তখন চুপিচুপি আকাশের সাথে কথা বলেন। তারাদের সাথে কথা বলেন। চাঁদের সাথে কথা বলেন। 'ফুলপরীদের' সাথে ভাব জমান। কখনও বা তাঁর ইচ্ছে হয় পাখি হতে। তিনি লেখেন–

"আমি হবো সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসুমবাগে উঠবো আমি ডাকি।
সূর্য মামা জাগার আগে উঠবো আমি জেগে
হয়নি সকাল ঘুমাও এখন–মা বলবেন রেগে।"

www.pathagar.com

মাকে তখন তিনি কি জবাব দেবেন তাও ঠিক করে ফেলেন। যেমন–

"হয়নি সকাল তাই বলে কি সকাল হবে নাকো?
আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে
তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে।"

ঘুম তাড়ানো, পাখি ডাকা, অসম্ভব সাহসী সেই প্রাণপ্রিয় কবি–কাজী নজরুল ইসলাম। আমাদের সবার অত্যন্ত আপন কবি। জাতীয় জাগরণের কবি। বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

কবির ছেলেবেলা কেটেছে অনেক দুঃখ-কষ্টে। পেট ভরে খেতে পাননি। ভালো জামা কাপড় পরতে পারেননি।

যে বয়সে ছেলেরা খেলাধুলা আর পড়াশোনা করে সময় কাটায়, সেই বয়সে তাঁকে আয়-রোজগার করতে হয়েছে। অন্যের রুটির দোকানে কাজ করতে হয়েছে।

স্কুলের ধরাবাধা লেখাপড়া তিনি বেশি করতে পারেন নি। তাই বলে তিনি কম পড়েননি। লেখাপড়ার প্রতি তাঁর ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ। তিনি নিজের চেষ্টায় বাংলা, ইংরেজি, ফারসি প্রভৃতি ভাষা খুব ভালোভাবেই শিখেছেন এবং সেইসব ভাষায় কবিতাও লিখেছেন।

তিনি ছিলেন অনেক বড় মাপের কবি। ব্রিটিশের গোলামি করতে পারেন নি বলে সাহিত্যে 'নোবেল' পুরস্কারও পাননি। তবুও তাঁকে বিশ্বমানের কবি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পৃথিবীর বহু ভাষায় তাঁর লেখা অনূদিত হয়েছে। এখনও হয়।

তিনি ছোটদের কথা কখনও ভোলেননি। ভুলবেন কেমন করে?

কারণ তাঁর হৃদয় ছিল অনেক বড়। সেই হৃদয়ে ছিল ছোটদের প্রতি ভালোবাসার অথই সমুদ্র।

তিনি ভালোবাসতেন মানুষ, দেশ, প্রকৃতি এবং নিজের জাতিকে। ছোটরা ছিল তাঁর অনেক আপন। আর আপন বলেই তিনি লিখেছেন ছোটদের জন্যে অজস্র কবিতা।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, কবির 'লিচু চোর', 'খুকু ও কাঠবিড়ালী', 'সওদাগর' 'ঝিঙে ফুল'–এধরনের মাত্র কয়েকটি ছড়া-কবিতার সাথে এখনকার ছোটরা পরিচিত। আগে তো পাঠ্য বইয়ে 'শিশু যাদুকর', 'সংকল্প' প্রভৃতি কবিতাগুলোও ছিল। এখন আর সেসব দেখা যায় না।

www.pathagar.com

কবি নজরুলের ছোটদের জন্য লেখা বইগুলোও এখন আর বাজারে তেমন পাওয়া যায় না। ফলে অনেকেই তাঁর বইয়ের সাথে পরিচিত নয়। তিনি ছোটদের জন্য কম করে হলেও তেরখানা বই লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে আছে : 'ঝিঙে ফুল' [১৯২৬], 'সঞ্চয়ন' [১৯৫৫], 'পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে' [৯৬৩], 'ঘুম জাগানো পাখি' [১৯৬৪], 'সাত ভাই চম্পা', 'ঘুম পাড়ানী মাসী-পিসী' [১৯৬৫], 'ফুলে ও ফসলে' [১৯৮২], 'ভোরের পাখি', 'তরুণের অভিযান', 'মটকু মাইতি', 'জাগো সুন্দর', 'চির কিশোর' প্রভৃতি।

'পুতুলের বিয়ে' নামক একখানা নাটিকাও তিনি লিখেছিলেন। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৩ সালে।

কবি নজরুলের ছড়া-কবিতার টানই অন্যরকম। যেন বসন্তের বাতাস হৃদয়ে ঢেউ খেলে যায়। আবার কখনো বা সাহস ও দিগবিজয়ের ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটে যায়। আর তাঁর ছন্দ ও শব্দের দোলা তো কখনই ভুলবার নয়। যেন যাদুর বাঁশি। নিচের 'ঝিঙে ফুল' কবিতাটির ছন্দের দোলার কথাই ধরা যাক না! এর তুলনা পাওয়া ভার। যেমন–

"ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল।
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে ফুল–
ঝিঙে ফুল।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢলে স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল
ঝিঙে ফুল ॥"

এতবড় কবি, যিনি সবাইকে, সবকিছুকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। তাঁর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি কবিতা পড়ে কি তৃপ্তি পাওয়া যায়?

আহ্! কতইনা ভালো হতো, যদি কবির সবগুলো ছোটদের বই আবার বাজারে পাওয়া যেতো!

আমরা যদি তাঁর সব লেখাই পড়তে পারতাম–তাহলে সত্যিই উপকৃত হতাম। জানতে পারতাম।

কবিকে ভালোবেসে, তাঁর এইসব বইগুলোকে পৃথকভাবে এবং একত্রে 'সঞ্চয়ন' আকারে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করতো তাহলে আমরা পেয়ে যেতাম এক মহামূল্যবান সম্পদ।

www.pathagar.com

কবি নজরুল ইসলামের অনেক স্বপ্ন ছিল। অনেক 'সাধ' ছিল।

তাঁর সে স্বপ্ন ও সাধকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের প্রতিটি শিশুর মনে। তিনি মানুষের জন্য, দেশের জন্য–যেমন নিজে জেগে থেকেছেন, তেমনি জাগাতে চেয়েছেন আমাদেরকে। 'সংকল্পে' দৃঢ় হয়ে ছুটতে বলেছেন। মানুষের মতো মানুষ হবার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন।

প্রকৃত অর্থে আমাদের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কী অসাধারণ প্রতিভাবান এক উজ্জ্বল পুরুষ ছিলেন!

কী কবিতায়, কী গদ্যে, কী শিশুতোষ রচনায়–সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সফল।

নজরুলের তুলনা এই উপমহাদেশে কেন, গোটা বিশ্বসাহিত্যেই বিরল। তিনি কী অপরিসীম দরদ দিয়ে লিখে গেছেন আমাদের জন্য কত বিচিত্র ধরনের কবিতা। কী চমৎকার শব্দ আর ছন্দে হেলে দুলে চলেছে তাঁর কবিতা। ঠিক যেন নদীর ঢেউয়ের ওপর দিয়ে বয়ে চলা ফিরফিরে বাতাসের দোলা। কখনো মনে হয়, বহুরঙা একটি আশ্চর্য ক্যানভাস। যেখানে সবুজ-শ্যামল প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে, আছে আকাশ আর নানা বর্ণের ফুল ও পাখির মেলা। কী চমৎকার উচ্চারণ!

নজরুল ইসলামের খুকি ও কাঠবিড়ালি কবিতায় দেখি অন্য রকম মজা। এ যেন কবিতা নয়, নাটকের খেলা। এর প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে ছড়িয়ে আছে শিশু মনের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা আর সংলাপ। আনন্দ, বেদনা, চাওয়া আর শিশুসুলভ খুনসুটিও আছে এখানে। যেমন–

"ডাইনি তুমি হোঁৎকা পেটুক,
খাও একা পাও যেথায় যেটুক।
বাতাবি লেবু সবগুলো
একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো!"

কিংবা–

"পেয়ারা দেবে? যা তুই ওঁচা!
তাইতো তোর নাকটি বোঁচা!
হুতমো-চোখী! গাপুস গুপুস
একলাই খাও হাপুস হুপুস!
পেটে তোমার পিলে হবে! কুড়ি-কুষ্টি মুখে!
হেই ভগবান! একটা পোকা যাস পেটে ওর ঢুকে!
ইস! খেয়োনা মস্তপানা ঐ সে পাকাটাও!
আমিও খুবই পেয়ারা খাই যে! একটি আমায় দাও।"

www.pathagar.com

প্রথম, এই প্রথমই আমরা কেবল নজরুলের কবিতাতেই এ ধরনের নতুন শব্দ, উপমা আর নাটকীয় দৃশ্য উপভোগ করলাম। শিশুতোষ কবিতা–তাও যে কত বিচিত্র ধরনের, বিচিত্র ঢঙ-এর হতে পারে, তা নজরুলের কবিতা পড়লেই কেবল বুঝা যায়। তাঁর কবিতায় রসিকতাও আছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও আছে। দুষ্টুমিও আছে বৈকি! 'খোকার খুশি'টা সামনে রাখি একটু!–

"সত্যি, কও না মামা,
আমাদের অমনি জামা
অমনি মাথায় ধামা
দেবে না বিয়ে দিয়ে?
মামী মা আসলে এ ঘর
মোদেরও করবে আদর?
ব্যস, কি মজার খবর!
আমি রোজ করব বিয়ে ॥"

মায়ের সাথেও তার দুষ্টুমির শেষ নেই। যেমন–

"অ মা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?
খ্যাঁদা নাকে নাচছে ন্যাদা–নাক ডেঙাডেং ড্যাং।
ওঁর নাকটাকে কে করল খ্যাঁদা র‍্যাঁদা বুলিয়ে?
চামচিকে–ছা বসে যেন ন্যাজুড় ঝুলিয়ে!
বুড়ো গরুর টিকে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং!
অ মা! আমি হেসে মরি, ন্যাক ডেঙাডেং ড্যাং!"
[খাঁদু-দাদু]

আবার এই নজরুলই দিদির বে'তে খোকার চোখের পানি আর বুকের কষ্টকে বাড়িয়ে তুলেছেন শতগুণে। কী অভূতপূর্ব এক হৃদয়স্পর্শী উচ্চারণ–

"মনে হয়, মণ্ডা মেঠাই
খেয়ে জোর আয়েশ মেটাই!–
ভাল ছাই লাগছে না ভাই,
যাবি তুই একেলাটি!
দিদি, তুই সেথায় গিয়ে
যদি ভাই যাস ঘুমিয়ে,
জাগাব পরশ দিয়ে
রেখে যাস সোনার কাঠি।"

যে নজরুল মায়ের সাথে দুষ্টুমি করলেন, সেই নজরুলই আবার মাকে নিয়ে লিখলেন হৃদয় কাঁপানো এক বিখ্যাত কবিতা। নজরুল ছাড়া এমন উচ্চারণ

www.pathagar.com

আর কোথায় আছে?–

"যেখানেতে দেখি যাহা
মা-এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ সে তো
আর কোনখানে কেহ পাইবে না ভাই!

হেরিলে মায়ের মুখ
দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরাণ,
মায়ের শীতল কোলে
সকল যাতনা ভোলে
কত না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান।"
[মা]

মাকে আমরা প্রচণ্ড ভালোবাসি। ভালোবাসতেন নজরুলও। তাইতো তাঁর কবিতায় ঘুরে-ফিরে মা এসেছেন-একেকভাবে, বিচিত্র অথচ বর্ণাঢ্য ভঙ্গিতে। 'খোকার বুদ্ধি'তে মা আছেন। মা আছেন 'খোকার গপ্প বলা'তেও। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় বটে, শিশুতোষ কবিতায় নজরুল যে পরিমাণ নতুন শব্দ, উপমা, সংলাপ আর নটাকীয়তা স্বার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, আর কোনো কবির মধ্যে তেমনটি পাওয়া যায় না। তাঁর 'লিচু চোর', 'হোঁদল-কুঁৎকুঁতের বিজ্ঞাপন', 'ব্যাংফুলী', 'পিলে পটকা', 'চিঠি' প্রভৃতি কবিতাতেও এর সাক্ষর রয়ে গেছে।

হ্যাঁ, নজরুলই তো ছোটদেরকে স্বপ্ন দেখাতে শিখিয়েছেন এভাবে–

"আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
উর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল।
আমরা ছাত্রদল ॥

মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে
যাত্রা নাঙ্গা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই
বিষম চলার ঘায়।
যুগে-যুগে রক্তে মোদের
সিক্ত হল পৃথিতল ॥
আমরা ছাত্রদল ॥"

www.pathagar.com

এখন আসি কবি নজরুল ইসলামের নাটক প্রসঙ্গে।

ভাবতেও অবাক লাগে!

যে কবি গোটা জাতিকে তাঁর কবিতা ও গান দিয়ে জাগিয়ে তুলেছিলেন, ঘুমন্তকে ঘুম ভাঙিয়েছিলেন সেই কবিই আবার লিখলেন অসাধারণ সব নাট্যগুচ্ছ! তাঁর নাটকের সংখ্যাও কি কম!

১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে, কাজী নজরুল ইসলাম সেই কিশোর বয়স থেকে শুরু করে ১৯৪২ সালে অসুস্থ হয়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত নাট্যকর্মের সাথে একান্তভাবে জড়িত ছিলেন।

কারো কারো মতে তিনি শতাধিক নাট্য রচনার কৃতিত্ব অর্জনকারী এক ঐতিহাসিক নাট্যকার।

কাজী নজরুল ইসলামের নাটক বলে কথা! সে নাটক কেবল রাজবাড়ির আঙিনায়, বা ছাদে, নিজস্ব কিছু বিদগ্ধ দর্শকের সামনে অভিনীত হয়নি। বরং তাঁর নাটক বাংলার পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে, জন সাধারণের সামনে বহুদিন এক নাগাড়ে অভিনীত হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। তাঁর নাটক, তৎকালীন নাট্যবোদ্ধা দর্শক, শিল্পী, অভিনেতা, নাট্য পরিচালক, সমালোচক কর্তৃক দারুণভাবে প্রশংসিতও হয়েছিল।

প্রখ্যাত নাট্য পরিচালক, অভিনেতা শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কাজী নজরুল ইসলামের 'মধুমালা' নাটক সম্বন্ধে বলেছিলেন,

"বিদগ্ধ সমাজ কাজী সাহেবের এই গীতিনাট্য দেখে বিমুগ্ধ হয়ে আমাদের অবিমিশ্র প্রশংসা করে গেছেন এবং সে সময় সংগীত রসিক ও শিল্পবোধসম্পন্ন দর্শক মহল অজস্র অভিনন্দন দিয়েছিলেন আমাদের। মধুমালার কথা, পরীদের গান, সংলাপের ভাষা সব কিছু মিলিয়ে এক মোহনীয় স্বপ্নাবেশের সূচনা হত প্রেক্ষাগৃহে। কবির রচনা যে সার্থক হয়েছিল তা সকলেই স্বীকার করে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।"

এটাই ছিল নজরুল ইসলামের নাটক সম্বন্ধে সমসাময়িক নাট্যদর্শক ও বিদগ্ধ জনের সত্যিকারের মূল্যায়ন।

এছাড়াও কাজী নজরুল ইসলামের রেকর্ড নাটিকাগুলোর বিপুল কাটতি ও অসম্ভব জনপ্রিয়তা, নাট্যরচনার ক্ষেত্রে কবির অসামান্য সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করে।

নজরুল ইসলাম কবি হলেও নাটক দিয়েই তাঁর জীবন শুরু। সেই

www.pathagar.com

কৈশোরকালে লেটোর দলে পালা গান রচনার মধ্য দিয়েই তাঁর সাহিত্য জীবনের হাতে খড়ি। অল্প বয়সেই তাঁর কলমের সোনার কাঠির পরশে স্থূল গ্রাম্য রসের লেটো গান হয়ে উঠেছিল মার্জিত, গতিশীল এবং সর্বজনপ্রিয়। আপন প্রতিভা বলেই ১২-১৩ বছর বয়সেই তিনি লেটো দলের উস্তাদের পদ পেয়ে যান এবং সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ পালাকারের সম্মানে ভূষিত হন। কী আশ্চর্যের বিষয়!

দুর্ভাগ্যবশত লেটোদলের জন্য লেখা সবগুলো পালাগান উদ্ধার করা যদিও সম্ভব হয়নি। যে কয়টা পাওয়া যায়, তার মধ্যে আছে : ১. আকবর বাদশা, ২. রাজপুত্রের সং, ৩. কবি কালিদাস, ৪. চাষার সং, ৫. ঠগপুরের সং, ৬. মেঘনাদ বধ, ৭. শকুনি বধ, ৮. দাতা কর্ণ, ৯. রাজা যুধিষ্ঠিরের সং, ১০. বিদ্যাভুতুম, ১১. বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রভৃতি পালাগানগুলো বিষয় বৈচিত্র্যে, লেখার চমৎকারিত্বে সেকালেই বাংলা সাহিত্যে একজন সফল নাট্যকারের আগমন সূচিত করেছিল।

১৯২৮ সালের দিকে কবি যখন গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগ দিলেন, তখন তাঁর নাট্যরচনার আর এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। এ সময় তিনি গ্রামোফোন রেকর্ড উপযোগী বহু একাঙ্কিকা, যাকে রেকর্ডনাটক বলা যেতে পারে, সেই ধরনের নাটক রচনা করেছিলেন। যার মধ্যে শিশুদের জন্য লেখা নাটক ছিল অন্যতম।

কাজী নজরুল ইসলামই ছিলেন এই ধরনের রেকর্ড নাটক রচনার সার্থক পথিকৃত। কষ্টের বিষয় বটে, তাঁর সব কয়টি রেকর্ডনাটকের তালিকাও আজ আর পাওয়া যায়না। সেগুলো উদ্ধার করাও এপর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। যে কয়টি মাত্র উদ্ধার করা গেছে তার মধ্যে আছে : ১. ঈদুল ফিতর, ২. খুকী কাঠবিড়ালী, ৩. আল্লার রহম, ৪. কবির লড়াই, ৫. কলির কেষ্ট, ৬. কানামাছি ভোঁ ভোঁ, ৭. বনের বেদে, ৮. শ্রীমন্ত, ৯. কালোয়াতী কসরত, ১০. পুতুলের বিয়ে, ১১. পুরনো বলদ, ১২. নতুন বৌ, ১৩. বাঙালীর ঘরে হিন্দি গান, ১৪. বিলাতি ঘোড়ার বাচ্চা, ১৫. ছিনি মিনি খেলা, ১৬. জুজু বুড়ির ভয়, ১৭. পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার, ১৮. খাঁদু দাদু, ১৯. চার কালা, ২০. বিয়ে বাড়ি, ২১. ভ্যাবাকান্ত, ২২. প্ল্যানচেট, ২৩. বিদ্যাপতি, ২৪. জন্মাষ্টমী প্রভৃতি। কবি নজরুল ইসলামের এই সব রেকর্ডনাটক গ্রামোফোন রেকর্ডের চাহিদাকে বিস্তৃত করেছিল। নাটকগুলোর বিষয়বস্তু ও সংলাপ তখন মানুষের মুখে মুখে শোনা যেত।

কবি নজরুল ইসলামের নাটকের সংখ্যা যে কত তা নির্দিষ্ট করে বলা

www.pathagar.com

মুশকিল। কারণ তাঁর সবগুলো নাটক সংরক্ষিত করা হয়নি। অনেকের মতে তিনি ছোট-বড় মিলিয়ে একশোটিরও বেশি নাটক রচনা করেছিলেন। যার মধ্যে চল্লিশটি মাত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। 'আলেয়া' ও 'মধুমালা' ছাড়াও কবির অন্যান্য নাটকের মধ্যে রয়েছে 'সেতুবন্ধ' [১৩৩৭], 'ঝিলিমিলি' [১৩৩৭], 'শিল্পী' [১৩৩৭], 'ভূতের ভয়' দেশাত্মবোধক নাটক], 'বিদ্যাপতি' [১৩৭৭], 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'শ্রীমন্ত', 'সাপুড়ে' প্রভৃতি নাটক।

মুসলমানের জাতীয় উৎসব 'ঈদুল ফিতর'। এই মহোৎসব বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে নাট্য সাহিত্যে একেবারেই অনুল্লেখ্য ছিল। মহান ঈদ উৎসব নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে দু'টি মাত্র নাটিকা রচিত হয়েছে, সে দু'টির রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম। এর আগে আর কেউ ঈদ নিয়ে নাটক লেখেননি। শিশুদের নিয়েও কবি অনেক উন্নতমানের নাটক রচনা করেছেন।

সাধারণত নাটকের গান নাট্যদৃশ্যের প্রয়োজনে রচিত হয় বলে, নাটকের বাইরে একক গান হিসাবে সেগুলো খুব একটা জনপ্রিয়তা পায়না। কবি নজরুল ইসলাম সেখানেও বিস্ময়করভাবে ব্যতিক্রমী ধারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অধিকাংশ গান নাটকের মধ্যে যেমন জনপ্রিয় হয়েছিল, তেমনি একইভাবে নাটকের বাইরেও সেই গানগুলো আজও জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যেমন–

'মোরা একবৃন্তে দু'টি ফুল' [পুতুলের বিয়ে]। 'বাসন্তিকা' নাটকের গান,–'অঞ্জলি লহ মোর', 'ভোরের স্বপনে কে তুমি; 'এল বনান্তে পাগল বসন্ত', 'দোলা লাগিল দখিনার বনে বনে'।

'হর প্রিয়া' নাটকের গান–'মেঘবিহীন খর বৈশাখে', 'ঝরঝর ঝরে শাওন ধারা'। 'কাবেরী তীরে' নাটকের গান–'কাবেরী নদী জলে কে গো', 'নীলাম্বরী শাড়ী পরি', 'রহি রহি সেই মুখ', 'নিশি রাতে রিম ঝিম ঝিম'। গুলবাগিচা নাটকের গান 'আধো আধো বোল', 'মোর প্রিয়া হবে এস রাণী'। 'অতনুর দেশ' নাটকের গান–'কথা কও কও কথা', 'তুমি শুনিতে চেওনা', 'যারে হাত দিয়ে মালা', 'আমায় নহেগো ভালোবাস'। 'বনের বেদে' নাটকের গান–'বাঁকা ছুরির মত', 'নিম ফুলের মৌ পিয়ে'। ঈদ' নাটকের গান–'নাই হল মা বসন'-ভূষণ এই ঈদে আমার'। 'ঝিলি মিলি' নাটকের গান–'স্মরণ পারের ওগো প্রিয়'। 'সেতুবন্ধ' নাটকের গান–'গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু' 'আলেয়া' নাটকের গান–'পোহাল পোহাল নিশি',

www.pathagar.com

'ভোরের হাওয়া এলে', 'আঁধার রাতে কে গো একেলা', 'এ নহে বিলাস বন্ধু', 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা', 'টলমল টলমল পদভারে'। প্রভৃতি গানগুলো নাটকের প্রয়োজনে রচিত হলেও এককগান হিসাবে আজও এগুলো সমান জনপ্রিয়।

কাজী নজরুল ইসলাম শুধু নিজেই গীতবহুল নাট্যরচনা করেননি, সমসাময়িক অনেক খ্যাতিমান নাট্যকারের নাটকের প্রয়োজনেও গান লিখে, সুর রচনা করে সে সব নাটকের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছিলেন। যেমন, শ্রী শচীন্দ্র সেন গুপ্তের 'রক্ত কমল' নাটকের জন্য তিনি নয় খানা গান লিখে দেন ও সুর সংযোজনা করেন। এগুলোর মধ্যে 'আসে বসন্ত ফুল বনে', 'ফাগুন রাতে ফুলের নেশায়', 'কেউ ভোলেনা কেউ ভোলে', 'কেমনে রাখি আঁখি বারি চাপিয়া', 'মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শ্রী শচীন্দ্র সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা', নাটকের জন্য তিনি সাত খানা গান লেখেন, যার মধ্যে 'আমি আলোর শিখা', 'পথহারা পাখি', 'কেন প্রেম যমুনা আজি', 'এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে' গানগুলো আজও সমান জনপ্রিয়। তিনি এই নাট্যকারের 'হর পার্বতী' নাটকের জন্যও নজরুল এগারোটি গান রচনা করেন।

কবি নজরুল ইসলাম মন্মথ রায়ের 'মহুয়া' নাটকের জন্য পনেরটি গান, 'কারাগার' নাটকের জন্য আটটি গান, 'সাবিত্রী' নাটকের জন্য তেরটি গান', 'লায়লী মজনু' নাটকে তেরটি গান, 'সতী' নাটকের জন্য দশটি গান, রেকর্ড নাটক 'সুরথ উদ্ধার'-এর জন্য এগারোটি গান, রেকর্ড নাটক 'কাফন চোরা'র জন্য পাঁচটি গান রচনা ও সুর সংযোজনা করেন।

এভাবেই তিনি যোগেশ চৌধুরীর 'কৃষ্ণ সখা সুদামা', অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের 'চণ্ডীদাস', সুধীন্দ্র রাহার 'সর্বহারা', 'আলাদীন', গিরিশ ঘোষের 'বিশ্বমঙ্গল; মহেন্দ্র গুপ্তের 'রুক্মিনী মিলন', 'দেবীদূর্গা', মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্নপূর্ণা', আশুতোষ সান্যালের 'বন্দিনী', দেবেন্দ্র রাহার 'অর্জুন বিজয়', বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'ব্ল্যাক আউট'সহ অন্যের লেখা প্রায় ৫০টি নাটকের জন্য গান রচনা ও সুর সংযোজনা করেন। এসব নাট্যগীতি শুধু নাটকের কারণে নয়, নিজস্ব সংগীত-গুণেও চির অমর হয়ে আছে।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বহু নাটকও প্রযোজনা করেছেন। তিনি একাধারে নাটক লিখেছেন, প্রযোজনা করেছেন, গান লিখেছেন, সুর করেছেন আবার কোনো কোনো নাটকে নিজে অভিনয়ও করেছেন।

www.pathagar.com

কী বিস্ময়কর এক প্রতিভা!

যিনি কবিতা, গানে কিংবা গজলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তিনিই আবার নাট্য ক্ষেত্রেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এমন সর্বকূল প্লাবিত প্রতিভা আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।

বলা যায় ধূমকেতুর মতো উদয় হয়েছিলেন মহান কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

নজরুল, কবি নজরুল ইসলাম ছোটদেরকে তাঁর লেখায় অনেক স্বপ্ন দেখিয়েছেন। সামনে চলার সাহস দেখিয়েছেন। তাদেরকে বুকে টেনে নিয়েছেন বড় মমতায়। কিশোর কাননে নজরুলের উপস্থিতি আর অবস্থান একজন প্রকৃত দরদী অভিভাবকের মতই। এজন্য তিনিও আমাদের হৃদয়ে মিশে আছেন গভীর শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায়। তিনি যে আমাদের কাছের কবি, হৃদয়ের কবি, আপন কবি, পরম প্রিয়।

ছোটদের নিয়ে কবির যে স্বপ্ন এবং সাধ ছিল, সেটা পূর্ণ হবে–যদি আমরা জ্ঞানে–বিজ্ঞানে, শিক্ষা ও আদর্শে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি।

যদি দেশ ও মানুষকে ভালোবাসতে পারি।

এই দরদী ও প্রেমিক কবি দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ইন্তেকাল করেন ১৯৭৬ সালের ২৯ শে আগস্ট, ঢাকায়।

না, তিনি মরেননি!

কবিরা কখনো মরেন না! এইতো তিনি বেঁচে আছেন। জেগে আছেন আমাদের মাঝে। মানুষের হৃদয়ে। আর জেগে থেকে কবি–এখনো প্রতিদিন ভোর হবার আগেই "ভোর হলো দোর খোল" বলে আমাদেরকে জাগিয়ে দেন।

কবির এই ডাক যেন আমরা ভুলে না যাই।

ভুলে না যাই আমাদের নিয়ে তাঁর স্বপ্ন ও সাধের কথা।

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিক
কাছের মানুষ আপনজন

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

একটি নাম, একটি বিস্ময়কর প্রতিভা!

সে প্রসঙ্গে পরে আসি।

এখন তাঁর ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে কিছুটা জেনে নেই।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক জন্মগ্রহণ করেন ১ মার্চ, ১৯৫৬ সালে। জন্মস্থান : গ্রাম-বারুইপাড়া, ডাকঘর-রায়পাড়া, ভায়া-ফকিরহাট, থানা এবং জেলা-বাগেরহাট। পিতার নাম মুন্সী কায়েমউদ্দীন মল্লিক এবং মাতা আছিয়া খাতুন।

তিনি মাদরাসা এবং সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। মাদরাসা লাইনে তিনি ফাজিল পাস করেন। সাধারণ শিক্ষায় তিনি ১৯৭৬ সালে প্রফুল্লচন্দ্র মহাবিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় মানবিক শাখায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ [অনার্স] বাংলায় ভর্তি হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি লেখা-পড়া সম্পন্ন করতে পারেননি। সেটা সম্ভবত কেবল তাঁর সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সাংগঠনিক ব্যস্ততার কারণে হতে পারে। সেটাই সম্ভব। কারণ তিনি ছিলেন আমগ্ন একজন সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমিক মানুষ।

কর্মজীবনে কবি মতিউর রহমান মল্লিক ১৯৮৫-১৯৯৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিআইসি কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য 'মাসিক কলম' পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি ১৯৯৮ সাল থেকে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী, ঢাকা; ঐতিহ্য সংসদ; প্রতিষ্ঠাতা সদস্য : কবিতা বাংলাদেশ; প্রতিষ্ঠাতা সদস্য : জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদসহ গোটা

www.pathagar.com

বাংলাদেশে বহু সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং তত্ত্বাবধান করেন।

তিনি ছিলেন সদা কর্মব্যস্ত একজন মানুষ। সাহিত্য-সংস্কৃতিই ছিলো তাঁর জীবনের একমাত্র উপজীব্য বিষয়। তাঁর সকল কর্ম তৎপরতা এবং ব্যস্ততা সে কেবল সাহিত্য-সংস্কৃতি কেন্দ্রিকই ছিলো। এর বাইরের জীবন ছিলো তাঁর কাছে নিতান্তই গৌণ।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি সাহিত্যের বেশ কিছু বিষয়ে লেখালেখি করলেও মূলত ইসলামি গানই ছিলো তাঁর প্রাণস্পন্দন। এজন্য তিনি কবি হয়েও কবিতায় খুব একটা বেশি সময় দিতে পারতেন না, যতটা দিয়েছেন গানের ক্ষেত্রে। সকল তাঁকে দেখা যেত গান নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছেন। তারপরও তিনি ছড়া-কবিতা বা অন্যান্য যা কিছু লিখেছেন তার সংখ্যাও কিন্তু নেহায়েত কম নয়। সেটা তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলো দেখলেই বুঝা যায়। যেমন–

আবর্তিত তৃণলতা [কবিতাগ্রন্থ], অনবরত বৃক্ষের গান [কবিতাগ্রন্থ], তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা [কবিতাগ্রন্থ], চিত্রল প্রজাপতি [কবিতাগ্রন্থ], নীষণ্ন পাখির নীড়ে [কবিতাগ্রন্থ], নির্বাচিত প্রবন্ধ [প্রবন্ধের বই], রঙিন মেঘের পালকি [ছোটদের ছড়ার বই], প্রতীতি-১ [ইসলামি গানের ক্যাসেট], প্রতীতি-২ [ইসলামি গানের ক্যাসেট], ঝংকার [গীতিকাব্য], যত গান গেয়েছি [গীতিকাব্য], প্রাণের ভেতরে [গীতিকাব্য], পাহাড়ী এক লড়াকু [অনূদিত কিশোর উপন্যাস]। প্রকাশের অপেক্ষায় আছে তাঁর আরো কিছু মূল্যবান গ্রন্থ।

সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি পেয়েছেন বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা। যেমন–

সাহিত্য পুরস্কার : সবুজ মিতালী সংঘ, বারুইপাড়া, বাগেরহাট; স্বর্ণপদক : জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা; সাহিত্যপদক : কলমসেনা সাহিত্য পুরস্কার, ঢাকা; সাহিত্যপদক : লক্ষ্মীপুর সাহিত্য সংসদ; সাহিত্যপদক : রাঙ্গামাটি সাহিত্য পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম; সাহিত্যপদক : খানজাহানআলী শিল্পীগোষ্ঠী, বারুইপাড়া, বাগেরহাট; সাহিত্যপদক : সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ; সাহিত্য পুরস্কার : সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদ, বাগেরহাট; প্যারিস সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ, ফ্রান্স; বায়তুশ শরফ সাহিত্য পুরস্কার : বায়তুশ শরফ আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম; কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার : কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন, ঢাকা; ইসলামি সংস্কৃতি পুরস্কার :

www.pathagar.com

ইসলামি সমাজ কল্যাণ পরিষদ, চট্টগ্রাম; সাহিত্য পুরস্কার : বাংলা সাহিত্য পরিষদ-ফ্রান্স।

তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশের জন্য বাংলাদেশের অত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত আজীবন চষে বেড়িয়েছেন। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় তিনি এজন্য পরিভ্রমণ করেছেন। স্বীকার করেছেন জীবনের বহু কষ্ট, ত্যাগ ও কুরবানী। বাংলাদেশ ছাড়াও তিনি ভ্রমণ করেছেন–

বৃটেন ১৯৮৫ : ইয়ং মুসিলম অর্গানাইজেশন, ইউরোপ; ভারত ১৯৯২ : স্টুডেন্টস ইসলামি মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া-এর বার্ষিক সম্মেলন; ভারত ২০০০ : ইকবাল পরিষদ-আয়োজিত সেমিনার; ভারত ২০০১ : ইকবাল পরিষদ-আয়োজিত সেমিনার; ফ্রান্স ২০০২ : বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ-ফ্রান্স; সিঙ্গাপুর ২০০২; সৌদী আরব ২০০৩।

এখন আসি কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাহিত্য-সংস্কৃতি জীবনের কিছুটা মূল্যায়ন প্রসঙ্গে।

আগেই বলেছি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

তিনি একাধারে কবি, গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন তিনি সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ।

কে চেনেনা তাঁকে!

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন আমাদের এই প্রাণের কবি ও গীতিকার।

তাঁকে কেন চিনবে না!

তিনি তো ছিলেন মানুষ হিসাবে সরল, সহজ এবং প্রাণবন্ত। হৃদয়টা ছিল তাঁর সাগরের মতো বিশাল।

তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন। প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। সেই ভালোবাসার কোনো তুলনা হয়না।

তিনি ফুল, পাখি, নদী, আকাশ, বাংলার প্রকৃতিকে খুব ভালোবাসতেন।

ভালোবাসতেন ছোটদেরকেও।

কবি বড়দের জন্য যেমন লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন ছোটদের জন্যও গান, কবিতা আরও কত কী!

www.pathagar.com

তাঁর মনটা কী হতে চায় সেটা বুঝা যায় নিচের 'মন হতে চায়' কবিতাটিতে। যেমন–

"মন হতে চায় গানের কলি
মন হতে চায় পদ্য,
মন হতে চায় শাপলা শালুক
মন হতে চায় পদ্ম।

রঙিন মেঘের পালকি চড়ে,
চায় হারাতে হাওয়ায় জোরে,
ভোরের আলোর সরোবরে
এক নিমিষেই অদ্য।

মন হতে চায় বকের পালক
বাবুই পাখির বাসা,
উধাও আকাশ সাতসাগরের
গভীর ভালোবাসা।

জোছনা মাখা চাঁদ দেখে সে
ঢেউয়ের মত উঠবে হেসে;
সবুজ নরম পাতার দেশে
নীড় বাঁধিতে সদ্য।"

কবির চোখ ও মন থেকে কোনো কিছুই হারিয়ে যায় না। ভোলেন না তাঁর চেনা-জানা চারপাশকে। এমনকি চড়ুই পাখিও কবির হৃদয়ে আসন করে নেয়। যেমন "স্বাধীন চড়ুই" কবিতাটি–

"কিচির মিচির ডাকছে চড়ুই
ছাদের খোপে খোপে;
আবার কখন যাচ্ছে উড়ে
ধারের কাছের ঝোপে,

ব্যস্ত বড় সকাল সাঁঝে,
সময় কাটায় কাজের মাঝে
রাত্রি হলে ঘাপটি মারে
দালান কোঠার খোপে।

উঠোন ভরা ধানের গাদায়
চড়ুই পাখির ঝাঁক
তাড়িয়ে দিতে মা-মনি ঐ
দিচ্ছে কেবল হাঁক।

www.pathagar.com

হাত বাড়িয়ে দুষ্টু ছেলে
হঠাৎ করে ধরতে গেলে
ফুড়ুত ফুড়ুত যায় উড়ে সব
তল্লাবাঁশের ঝোপে।"

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন একজন স্বপ্নচারি কবি। তিনি নিজে স্বপ্ন দেখতেন। অন্যদেরকেও স্বপ্নের জগতে টেনে নিতে ভালোবাসতেন। আর ছোটদের ব্যাপারেতো কথাই নেই। তাদের নিয়ে তিনি কত যে স্বপ্নের জাল বুনতেন তার কোনো হিসাব নেই। ছোটদেরকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। তাদেরকে নিয়ে সকল সময় স্বপ্ন দেখতেন। তাদেরকে সাহসের ফুলকিতে জাগিয়ে তুলতেন। যেমন কবির 'আলোর আশা' কবিতাটি আমরা পাঠ করে দেখতে পারি। কবি কী সুন্দরভাবেই না লিখেছেন–

"নামবে আঁধার তাই বলে কি
আলোর আশা করবো না?
বিপদ-বাধায় পড়বো বলে
ন্যায়ের পথে লড়বো না?

মেঘ দেখে চাঁদ
যায় কি দূরে হারিয়ে?
যায় কি নদী
পাহাড় দেখে পালিয়ে?
হায়-হতাশায় মরবো শুধু
আশায় হৃদয় ভরবো না?

দুঃখ আছে তাই বলে কি
স্বপ্ন সুখের দেখতে নেই?
রণাঙ্গনে হার আছে তাই
জিতার কানুন শিখতে নেই?

বজ্রপাতের ভয় আছে তাই বিহঙ্গ
পাখার ভেতর গুটিয়ে রাখে সব অঙ্গ?
ঝড়-তুফানে মরবো বলে
সাগর পাড়ি ধরবো না?"

এভাবেই কবি তাঁর ছড়া-কবিতায় সাহসের কথা বলেছেন, স্বপ্নের কথা বলেছেন, আশার কথা বলেছেন, যোগ্য মানুষ হবার জন্য যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠার কথা বলেছেন।

www.pathagar.com

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন একেবারেই সোঁদাগন্ধ মাটি ও মানুষের কবি। আগেই বলেছি কবি ফুল, পাখি, নদী প্রভৃতির সাথে নিজেকে যুক্ত করে ফেলেছিলেন। খুব কাছ থেকে তিনি এসব দেখেছেন। ফুলের গন্ধ নিয়েছেন। কখনওবা সেই ফুলকে বানিয়েছেন তিনি আশা ও স্বপ্নের চারণভূমি। যেমন তার 'ফুলের মতো' কবিতাটি–

"শিউলি যেমন খুব সকালে
সাজায় বনোতল,
তেমনি আমি সকাল হলেই
বাড়িয়ে মনোবল–

নিজেই নিজের ঘুম তাড়াবো
করবো যা দরকারী,
মন লাগিয়ে মনের মতই
সাজাবো ঘরবাড়ি।

ফুটেফুটে ফুল গন্ধরাজের মত
ফুটফুটে ঠিক রইবো অবিরত।

আমার স্বভাব করবো আমি
গোলাপ ফুলের ন্যায়;
আমার সুবাস ছড়িয়ে যাবে
সকল আঙিনায়।

সন্ধ্যাবেলায় উঠলো ফুটে
যেমন সন্ধ্যামণি,
ঐ সময়ে পড়ার ঘরে
ফুটবো আমি তেমন করে
গভীর মনোযোগের সাথে
তুলবো পাঠের ধ্বনি।

যে রজনীগন্ধা সারারাত ধরে,
গন্ধ বিলায় নির্জনতার হাত ধরে;
আমিও যেন সেই রজনীগন্ধ হই
রাত্রি জুড়ে আর সাধনায় মগ্ন রই।"

ছড়া-কবিতায় তিনি যেমন দক্ষ ও সাবলীল ছিলেন, তার চেয়েও বেশি ছিলেন গানের ক্ষেত্রে। বলা যায় বর্তমান সময়ে ইসলামি গানের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর হাতেই উঠে এসেছে

www.pathagar.com

অজস্র কালজয়ী গান।

গভীর রাত। চারপাশ নীরব-নিস্তব্ধ। পৃথিবীর বুক জুড়ে নেমে এসেছে কোলাহলমুক্ত এক প্রশান্তির আরাম। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে পৃথিবী ও প্রকৃতিও। এ সময় যদি কেউ তাঁর সেই বিখ্যাত গানটি আস্তে, খুব ধীরে কান পেতে শোনে, তাহলে মনের ভেতরটা দুলে উঠবে নিশ্চয়ই! যেমন–

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
নেই কেহ নেই আল্লাহ ছাড়া ॥
পাখির গানে গানে, হাওয়ার তানে তানে
ঐ নামেরই পাই মহিমা হলে আপন হারা ॥

ফুলের ঘ্রাণে, অলীর গুঞ্জরণে
ঐ নামেরই গান শুনে মন দেয় যে নীরব নাড়া ॥
নদীর কলকলে, ঢেউয়ের ছলছলে
ঐ নামরেই সুর শোনা যায় হলে আপন হারা ॥

তারার চোখে চোখে, চাঁদের মুখে মুখে
ঐ নামরেই নূর দেখা যায় হলে পাগল পারা ॥
আকাশ নীলে নীলে, মুখর ঝিলে ঝিলে
ঐ নামরেই ঝরনাধারা আকুল ব্যাকুল পারা ॥"

সত্যিই কী আশ্চর্য! মনটি মুহূর্তেই পরিবর্তন হয়ে যায়। একটু আগের সেই ব্যাকুলতা কিংবা অস্থিরতা আর কিছুই থাকে না। বরং তার বদলে সেখানে নেমে আসে এক কোমল স্নিগ্ধতা। যেন শান্ত দিঘি। তার মধ্যে ফুটে আছে হাজারো পদ্মফুল। আর মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরা টপকে উড়ে যায় আনন্দ ও আত্মবিশ্বাসের সবুজ টিয়া। নিঃশ্বাস ভরে বুকে টেনে নেওয়া যায় গানটির কথা, সুর, অর্থ এবং স্বয়ং গায়ককেই। মনটি স্থির তখন, প্রশান্ত এবং প্রগাঢ় এক সাগর।

কিন্তু কেন? প্রশ্নটির জবাব সহজে দেয়া খুবই কঠিন। কারণ গানটির গীতিকার, সুরকার এবং গায়ক যে স্বয়ং আমাদের একান্ত কাছের মানুষ, আপনজন–মতিউর রহমান মল্লিক!

তাঁকে কি কখনো ভোলা যায়? সেটা সম্ভবও নয়। কারণ তাঁর সাথেই যে আমরা সাহিত্য-সংস্কৃতির পথে হেঁটেছি দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে! একই পথে, একই বৃত্তে, একই আঙিনায়, একই বিশ্বাসে আমাদের হাঁটা-চলা, বসবাস। কত কাছ থেকে তাঁকে দেখা! কতভাবে দেখা! যাকে এত বেশি

www.pathagar.com

করে দেখা হয়, তাঁর বর্ণনা কী আর সহজেই দেয়া যায়? তাইতো অসমাপ্ত রয়ে যায় অনেক কথা, অনেক স্মৃতি, অনেক আবেগ কিংবা বহু ঘটনাপ্রবাহ।

মহান রাব্বুল আলামীন দয়ার সাগর। একমাত্র তাঁর কাছেই জমা আছে রহমতের ভাণ্ডার। তিনি তা থেকে যাকে ইচ্ছা দান করেন অকৃপণে।

মতিউর রহমান মল্লিককেও আল্লাহপাক দান করেছিলেন বহুগুণ, বহু যোগ্যতা, আর বহুমুখী প্রতিভা। তিনি যে শুধু ভাল গান লিখতেন কিংবা গান গাইতেন শুধু তাই নয়। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সংগঠক, বাগ্মী এবং সর্বোপরি ইসলামি আদর্শ-ঐতিহ্যের এক সাহসী ঈগল। বাংলাদেশে ইসলামি গানের প্রচলন, প্রচার, প্রসার এবং এটাকে দেশের অলিতে-গলিতে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে তাঁর রয়েছে এক অসামান্য অবদান। তিনি পালন করেছেন পথিকৃতের ভূমিকা। অক্লান্ত শ্রম, ত্যাগ, সাধনা, নিষ্ঠা আর এক অপরিমেয় স্বপ্নের সকল বিষয়-আশয় কেন্দ্রিভূত ছিল তাঁর বিশাল হৃদয় জুড়ে।

কী ছিল তার প্রত্যাশা? এর একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি তারই লেখা গানের মাধ্যমে :

"আমার কণ্ঠে অমন সুধা দাও ঢেলে দাও হে পরওয়ারদেগার
যা পিয়ে এই ঘুমন্ত জাতি ভাঙে যেন রুদ্ধ দুয়ার ॥
আমার গানের পরশ পেয়ে
অশ্রুধারায় ওঠে নেয়ে শাহাদাতের ভাগ্য চেয়ে
জীবন জুড়ে আনে জোয়ার ॥
আমার গানের সুরে প্রভু দিও দিও অগ্নিধারা
দ্বীন কায়েমের চির সবুজ অনুভূতি পাগলপারা ॥
আল কুরআনের আয়াত দিয়ে
তৌহিদেরই শরাব পিয়ে হেরার পথের রোশনী নিয়ে
পার হয়ে যাই দূর পারাবার ॥"

মূলত 'দ্বীন' কায়েমের চির সবুজ অনুভূতিতেই তিনি সারাটি জীবন 'পাগলপারা' হয়েছিলেন। এজন্যই তিনি মহান রবের কাছে 'প্রার্থনা' করতেন–

"আমার কণ্ঠে এমন সুধা
দাও ঢেলে দাও হে পরোয়ার
যা পিয়ে এই ঘুমন্ত জাত
ভাঙে যেন রুদ্ধ দ্বার।

www.pathagar.com

আমার গানের পরশ পেয়ে
অশ্রুধারায় ওঠে নেয়ে
শাহাদাতের ভাগ্য চেয়ে
জীবন জুড়ে আনে জোয়ার।

আমার গানের সুরে প্রভু
দিও দিও অগ্নি-ধারা
দ্বীন কায়েমের চির সবুজ
অনুভূতি পাগল পারা...

আল-কোরানের আয়াত দিয়ে
তৌহীদেরই শরাব পিয়ে
হেরার পথের রুশনী নিয়ে
পার হয়ে যায় দূর পারাবার।"

কিংবা–

"দাও খোদা দাও হেথায় পূর্ণ ইসলামি সমাজ
রাশেদার যুগ দাও ফিরায়ে দাও কোরানের রাজ ॥

কোটি কোটি মানুষ হেথায় বঞ্চিত রে বঞ্চিত
বাতিল মতের জিন্দানে হায়! লাঞ্ছিত
জলে স্থলে বিভীষিকা হায়
পশুত্ব আর বর্বরতায়
তাই তো হেথায় আজ কামনা
খোদা তোমার রাজ ॥

লাখ শহিদের রক্তে এদেশ রঞ্জিত রে রঞ্জিত
লক্ষ মায়ের বক্ষে ব্যথা সঞ্চিত রে সঞ্চিত
কত ভাই যে হারিয়ে গেল
কত বন্ধু প্রাণ হারালো
সকল ব্যথা ভুলবো পেলে
খোদা তোমার রাজ।

আর কত চাও রক্ত খোদা উজার এদেশ উজার প্রায়
আর কত চাও শহিদ খোদা উজাড় এদেশ উজাড় প্রায়
চাইলে আরো নাওগো আরো
রক্ত সাগর ভরো ভরো
সকল কিছুর বদলাতে দাও
খোদা তোমার রাজ ॥"

www.pathagar.com

তিনি নবীন-তরুণদেরকে দু'হাত বাড়িয়ে আহবান জানাতেন এভাবে–

"আগুনের ফুলকিরা এসো জড়ো হই
দাবানল জ্বালবার মন্ত্রে
বজ্রের আক্রোশে আঘাত হানি
মানুষের মন গড়া তন্ত্রে।

এসো বন্যার খরতেজ মাড়িয়ে
এসো উল্কার ক্ষিপ্রতা ছাড়িয়ে
নির্দয় নির্মম আঘাত হানি
তাগুতের সব ষড়যন্ত্রে।

তৌহিদী বিপ্লব দিকে দিকে আনো আজ
শান্তির সয়লাব বুকে বুকে দানো আজ।

এসো সত্যের সূর্যটা উদিয়ে
এসো জেহাদের সঙ্গীন উঁচিয়ে
প্রলয়ের হুংকারে ধ্বংস আনি
বাতিলের সব ষড়যন্ত্রে।"

এমন গান শুনে কে আর ঘুমিয়ে থাকতে পারে? তারপরও তিনি নিশ্চিত হতে পারে না। উদার কণ্ঠে ডাক দেন–

"এই দুর্যোগে এই দুর্ভোগে আজ
জাগতেই হবে, জাগতেই হবে তোমাকে।
জীবনের এই মরু বিয়াবানে
প্রাণ আনতেই হবে, আনতেই হবে তোমাকে।
জড়তার দেশে দাও দাও হিন্দোল
বহাও বন্যা তৌহিদী হিল্লোল
অমারাত্রির সকল কালিমা মুছে
সূর্য উঠাতেই হবে, উঠাতেই হবে তোমাকে।

এখানে এখনও জাহেলী তমদ্দুন
শিকড় গাড়ার প্রয়াসে যে তৎপর
সজাগ সান্ত্রী প্রস্তুতি নাও নাও
প্রতিটি শিকড় উপড়াতে পরপর

কুফরির ভিত ভাঙার সময় হলো
মরু সাইমুম আগুনের ঝড় তোলা
কোরানের ডাকে বাতিলের ঝংকার
শেষ করতেই হবে, করতেই হবে তোমাকে।"

www.pathagar.com

কারণ তিনি তাঁর আত্মপরিচয়ে বলীয়ান। এজন্যই তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলতে সাহস পান–

"মুসলিম আমি সংগ্রামী আমি
আমি চির রণবীর
আল্লাকে ছাড়া কাউকে মানি না
নারায়ে তাকবীর।
নারায়ে তাকবীর ॥

বিপ্লবী আমি চির সৈনিক
চির দুর্জয় চির নির্ভীক
আলকোরানের শমশির আমি
কুটি কুটি করি রাতের ভিড়
নারায়ে তাকবীর ॥

কে সে কহে আমি ভেসে গেছি আজ মিথ্যার সয়লাবে
শক্তি আমার দেখিও আবার বাজবে দামামা যবে

আল্লার আমি শক্তি অসীম
আলী হায়দার ইবনে কাসিম
সারা দুনিয়ার সরদার আমি
চির উন্নত উচ্চ শির
নারায়ে তাকবীর ॥

মুসলিম জাগে কারবালা শেষে কঠিন শপথ করে
লাখো শহিদের কলিজার দামে নতুন পৃথিবী গড়ে

সেই মুসলিম চির উদ্দাম
তাইতো বজ্র শপথ নিলাম
আল্লাহর রাজ গড়বো এবার
চির শান্তির সুখের নীড়
নারায়ে তাকবীর ॥"

এই কবিই আবার মহান রবের সৃষ্টি রহস্য দেখে অবাক হয়ে যান। বিস্ময় সুরে গেয়ে ওঠেন–

"মাঠ ভরা ঐ সবুজ দেখে
নীল আকাশের স্বপ্ন এঁকে
যার কথা মনে পড়ে...
সে যে আমার পালনেওয়ালা।

www.pathagar.com

ঐ যে পাখি মেল্‌লো পাখা
কোন্ অজানার পথে একা
ও যেন স্বপ্ন দেখা
ও যেন কাব্য লেখা
যার প্রেমে সুরে সুরে...
সে যে আমার পালনেওয়ালা।

ঐ যে দূরে মেঘের খেলা
জোনাক জোনাক তারার মেলা
ও যেন শিল্পপরী
কি মধুর মরি! মরি!
যার ছোঁয়া লেগে ওরে...
সে যে আমার পালনেওয়ালা।
ঐ যে অলী ফুলের কানে
বললো কথা গানে গানে
আহারে জুড়িয়ে গেল
বেদনা ভুলিয়ে গেল
যার স্বরলিপি পড়ে...
সে যে আমার পালনেওয়ালা।"

বলতে দ্বিধা নেই, তাঁর অনেক বিখ্যাত গানের মতো ওপরে উদ্ধৃত গানগুলোও মনে করি শ্রেষ্ঠ এবং অমর। যুগ যুগ ধরে এ সকল গান আমাদের প্রেরণা এবং সাহস যুগিয়ে যাবে।

ইসলামি গানের পাশাপাশি বাংলাদেশে ইসলামি সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রেও তার রয়ে গেছে অসীম অবদান। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া-ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলব্যাপী তিনি ছিলেন সদা চলিষ্ণু, পরিভ্রমণশীল। ক্রমাগত ছুটে চলেছিলেন তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। তিনি সর্বদাই ছিলেন ক্লান্তিহীন, সর্বদাই ছিলেন চলমান এবং বহমান। যেন বয়ে চলেছে কপোতাক্ষর স্বচ্ছ এক স্রোতধারা। দুর্বার ধারায়। অবিশ্রান্ত গতিতে। তিনি মনে করতেন–

"খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের সাহিত্য, আমাদের সংস্কৃতি যেন একটি স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়। সেই জন্যে আমাদের অনুষ্ঠানগুলো যেন এমনই হয় যাতে মাটি-মানুষ-আদর্শ-সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ স্বাভাবিকভাবে ঘটে। সেক্যুলার অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ্যবাদী অনুষ্ঠান কিম্বা সমাজতান্ত্রিক অনুষ্ঠান আর আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে যদি কোন পার্থক্যই না থাকে-তাহলে তা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের অনুষ্ঠানগুলো হতে হবে সব দিক থেকেই সুন্দর, কিন্তু একটি আলাদা ইমেজের উত্তাপে উৎপন্ন।

www.pathagar.com

বাতিল সংস্কৃতিবাদীদের সমস্ত উদ্যোগ সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিফহাল থাকতে হবে। রাজনীতি করতে হলে, আন্দোলন করতে হলে যেমন প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও আন্দোলনের রণকৌশল সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয়, অর্থাৎ তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কেও পরিপূর্ণ খোঁজ-খবর রাখতে হবে। খোঁজ-খবর রাখতে হবে অপসংস্কৃতিবাদীরা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির কোন কোন হাতিয়ার কোন কোন কায়দায় ব্যবহার করে যাচ্ছে এবং এই সব ব্যাপারে, এই অপতৎপরতার প্রতিরোধে কি কি করণীয় আছে-আমাদের সেসব নিয়েও ভাবতে হবে।"

ইসলামি সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ছিলো স্বচ্ছ ধারণা। আমাদের এক্ষেত্রে কী করণীয় সেই সম্পর্কেও তিনি গভীরভাবে ভাবতেন। তাঁর সেই চিন্তাধারা কেমন ছিলো আমরা একটু জেনে নিই। তিনি বলতেন–

"যে সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে, সে সময়ে আমাদের এই জাতির বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের মূল ভিত্তিভূমি তছনছ করে দেয়াই হচ্ছে শত্রুদের প্রধান লক্ষ্য। কারণ তারা জানে, এই জাতির ঐক্যের সর্বোত্তম হাতিয়ার যে-ঈমান, সেই ঈমানকে পর্যুদস্ত করতে না পারলে এই জাতিকেও পর্যুদস্ত করা যাবে না, সে জন্যেই তারা চায় আমাদের ঈমান যেন আমাদের রাজনীতির সাথে জড়িত না থাকে, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য-ভাবনা, সংস্কৃতি-চিন্তা, দেশপ্রেম, মানবপ্রীতির সাথে সংযুক্ত না থাকে; সেই কারণেই আমাদেরকে কেবল বিচ্ছিন্ন রাখতে চায়, বিভক্ত রাখতে চায়, নিরপেক্ষ রাখতে চায়, অন্ধ রাখতে চায়।

তারা জানে যে, সাহিত্য হচ্ছে জীবনের দর্পণ আর সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির শুদ্ধতম পরিচয়, কিন্তু সেই দর্পণ যদি ঈমানের পারদে অভিষিক্ত হয়, সেই পরিচিতি ঈমানের আলোয় আলোকিত থাকে তাহলে ঐ ঈমানদীপ্ত জাতিকে পদানত করা সম্ভব নয়। তারা এও জানে, বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ব্যূহ ভেদ করতে হলে সর্বপ্রথম সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ওপরই হামলা করতে হবে। হামলা করতে হবে সূক্ষ্মভাবে-অপসাহিত্য ছড়িয়ে দিয়ে, অপসংস্কৃতির পাচার করে। তাই তো তারা নানা কলা-কৌশলের মধ্য দিয়ে করছে, দেদার করে যাচ্ছে। আর তা করতে গিয়ে তারা লক্ষ-লক্ষ-কোটি-কোটি টাকা ব্যয় করে যাচ্ছে। বিষয়টি বুঝতে হবে বিপ্লবী অভিভাবকদের।

অন্তত আর কেউ না বুঝুক জাগ্রত তারুণ্যকে তা বুঝতে হবে, তা বুঝতে হবে অরুণপ্রাতের তরুণ দলকে-যারা 'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্ন উতলা

www.pathagar.com

ধরণীতল' হলেও 'চলরে চলরে চল' গাইতে গাইতে 'হেরার রাজতোরণ'-এর দিকে ধাবিত হয়। প্রধাবিত হয় বিপুল বন্যাবেগে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, উল্লাসে।"

বাংলাদেশে ইসলামি সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রগণ্য ভূমিকা সকল সময়ই আমাদের কাছে প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে যাবে।

ব্যক্তি হিসাবেও মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন অনন্য, ব্যতিক্রমী। তাঁর মধ্যে যেমন ছিল ধৈর্য, সহনশীলতা, উদারতা, মমতাবোধ, ঠিক তেমনি ছিল দায়িত্ববোধও। কাউকে কাছে টানার মত উদারতা এবং গ্রহণ ক্ষমতা, কখনো বা অভিভাবকের মতই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা সবার মধ্যে সমানভাবে থাকে না। কিন্তু তাঁর মধ্যে সেটা ছিল। এ এক বিরল মানবিক গুণ, যার সাথে অন্য কিছুর তুলনা চলে না। তাঁর মধ্যে আবেগের প্রচণ্ডতা ছিল বটে, কিন্তু অহম বোধ ছিল না। আবার সতর্ক ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিও ছিল তীক্ষ্ণ। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, তিনি যতই সরল-সহজ এবং উদার হোন না কেন- ইসলামি আদর্শ ও ঐতিহ্যের ব্যাপারে এতটুকুও ছাড় দিতে নারাজ ছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় মেলে কবির গোটা জীবনে।

মতিউর রহমান মল্লিক আর একটি বিশেষ গুণ ছিল–বাগ্মিতা। তিনি এত সুন্দর করে বক্তৃতা দিতে পারতেন, এমন গুছিয়ে কথা বলতে পারতেন এবং বিষয় ও বর্ণনাকে এতই আকর্ষণীয় করে তুলতে পারতেন যে, শ্রোতাদের মুগ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকতো না। বাগ্মিতা–এটাও আল্লাহর দেয়া এক বিশাল নিয়ামত। এই নিয়ামত তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর বলার ঢং, বিষয়ের গভীরে প্রবেশের ক্ষমতা এবং সরল, অথচ তথ্যবহুল ব্যাঞ্জনাধর্মী উপস্থাপনায় শ্রোতারা আপ্লুত না হয়ে পারতেন না।

তিনি যে প্রাণস্পর্শী গান-কবিতা লিখেছেন তার শক্তি, সাহস আর স্বপ্নের চারণভূমি ছিলো শাশ্বত সুন্দরের আদর্শিক সাহিত্য-সংস্কৃতি জাগরণের সীমাহীন-সীমানা, পলল জমিন। এখানে ব্যক্তিস্বার্থ, খ্যাতির মোহ কিংবা কোনো প্রকার জাগতিক লোভনীয় সুযোগই অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। ভ্রুক্ষেপহীনে তিনি এই সকল বৈষয়িক আগুনের পর্বত টপকে এসেছিলেন। আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রশ্নে তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার দ্বিধা ছিলো না, সংশয় ছিলো না, ছিলো না কোনো দোদুল্যমানতা। বরং তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সর্বদা সচেষ্ট এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এমনটিই তো সকলের হওয়া উচিত!

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন আশির দশকের কবি। সুতরাং একজন আধুনিক কবির মতই তাঁর গতিবেগ, তাঁর উচ্চারণ ও উপস্থাপনা কৌশল ছিলো। ব্যতিক্রমী যেটা, সেটা হলো তাঁর কবিতার সাথে আদর্শ, ঐতিহ্য, মানবিকতা প্রভৃতির সংশ্লিষ্টতা।

এখানেই দূরত্ব রয়ে গেছে চলমান বৈরী ধারার আধুনিক কবিদের মাঝে তাঁর। এই দূরত্ব পথের, বিশ্বাসের, ঐতিহ্যের এবং জীবনধারার। এই দূরত্ব ছিল অনিবার্য।

তাঁর একটি কবিতা আছে এমন–

"আমাদের পথ কোরানের পথ
এই পথ নির্ভুল,
এই পথে আছে আল্লাহ' ও তার
আখেরী রাসূল।
.....
আমাদের পথ ঈমানের পথ,
জেহাদের পথ ঠিক,
এই পথে মোরা চির নির্ভয়,
চিরদিন নির্ভীক।"

এ ধরনের জাগরণমূলক উচ্চারণ ছাড়াও তার কবিতা, গান ও ছড়ার একটি বিশাল অংশ জুড়ে আছে গ্রাম-বাংলা, প্রকৃতি এবং সবুজের রূপ-বৈচিত্র্য। একেবারেই যেন মাটির গভীর থেকে উঠে আসা তরতাজা কবিতা ও গান। ঠিক যেন লাউ কিংবা পুঁইশাকের নতুন বেড়ে ওঠা লকলকে পাতা। কী চমৎকার! কেবলি পড়তে মন চায়। এ হলো একজন আধুনিক কবির সুমার্জিত ও পরিশীলিত নান্দনিক উচ্চারণ। সুতরাং এর আবেদন সুদূরপ্রসারী।

এমন করেই কবি তাঁর সুন্দর শব্দ-ছন্দে কতকিছু এঁকে গেছেন আমাদের জন্য। সত্যি বলতে, এভাবেই মতিউর রহমান মল্লিক প্রবেশ করেছেন বাংলাদেশের লাখো ঘরে আর অগণিত হৃদয়ে।

সকল ঝিনুকে মুক্তা থাকে না। যেটায় থাকে, সেটা অত্যন্ত মূল্যবান। মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন তেমনি এক মূল্যবান মুক্তা খণ্ড। এটাই আমাদের জন্য আনন্দের বিষয়।

এই অসামান্য বরেণ্য কবি ইন্তেকাল করেন ১১ আগস্ট, ২০১০ সালের দিবাগত রাতে [প্রথম রোজার সাহরীতে]।

www.pathagar.com

তিনি দৈহিকভাবে আমাদের মাঝ থেকে চলে গেলেও আমরা তাঁকে কিভাবে ভুলবো?

এমন একজন প্রকৃত দরদি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন স্বপ্নচারি কবিকে কি কখনো ভোলা যায়! যায় না।

এইতো তিনি বেঁচে আছেন, জেগে আছেন আমাদের হৃদয়ে ও মননে। প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্তের উচ্চারণে।

আশা করি এভাবেই কবি মতিউর রহমান মল্লিক বেঁচে থাকবেন যুগ থেকে যুগান্তর, কাল থেকে কালান্তর পর্যন্ত।

www.pathagar.com

রূপালি পর্দার সোনালি মানুষ
শেখ আবুল কাসেম মিঠুন

www.pathagar.com

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল বহুকাল থেকে ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। এটা শুধু বিশ্বখ্যাত সুন্দরবনের কারণেই নয়, এর বাইরেও রয়েছে বিভিন্ন অনুষঙ্গ। অনেক কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিকসহ গুণীজনের জন্মস্থান এই দক্ষিণ অঞ্চল।

এই অঞ্চলেরই একটি বৃহত্তর জেলা এবং বিভাগ খুলনা।

খুলনার জেলা অধীনে ছিল অনেকগুলো মহকুমা। যেগুলো পরবর্তীতে জেলা হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। যেমন সাতক্ষীরা।

সাতক্ষীরা ছিল পূর্বে খুলনা বিভাগের একটি মহকুমা। এখন সেটি একটি জেলা হিসাবে পরিগণিত।

এই বৃহত্তর খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার [বর্তমানে জেলা] আশাশুনিতে জন্মগ্রহণ করেন এক বরেণ্য ব্যক্তিত্ব–শেখ আবুল কাসেম মিঠুন। আশাশুনি এখন একটি উপজেলা হিসাবে পরিগণিত।

শেখ আবুল কাসেম মিঠুন জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫১ সালের ১৮ এপ্রিল সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার দরগাহপুর গ্রামে। পিতার নাম শেখ আবুল হোসেন এবং মায়ের নাম হাফিজা খাতুন।

তাঁর বংশের প্রায় সবাই জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ছিলেন। অনেকেই হয়তো জানেন, বাংলায় বুখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ করেন শেখ বজলুর রহমান দরগাহপুরী, যিনি পশ্চিম বাংলার বিধানসভার সদস্য ছিলেন। অধুনালুপ্ত শিশু-কিশোর পত্রিকা 'গুলবাগিচা'র সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আবদুল

www.pathagar.com

ওহাব সিদ্দিকী। কারী শেখ মাহমুদ আলী, ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক আনিস সিদ্দিকী, মনোয়ারা বেগম, নিগার সুলতানা নার্গিস–এদের নামতো অনেকেরই জানা! তাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে রেখে গেছেন অনেক মূল্যবান অবদান।

এই বিখ্যাত পরিবারই অধস্তন সন্তান শেখ আবুল কাসেম মিঠুন। তিনি শৈশব কাল থেকেই ছিলেন অত্যন্ত নম্র, ভদ্র এবং শান্ত যে কারণে সবাই তাঁকে অত্যন্ত আদর ও স্নেহ করতেন। আর পারিবারিক সূত্রে তিনি গড়ে ওঠেন একজন উদার চিত্তের স্বাপ্নিক মানুষ হিসাবে।

শেখ আবুল কাসেম মিঠুন পড়ালেখায় হাতেখড়ি নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, পরে রাড়ুলি হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৯৬৯ সালে দরগাহপুর হাইস্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করে খুলনায় এসে সিটি কলেজে ভর্তি হন। পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেন।

বড় হবার পর কৈশোর এবং যৌবন কাল থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন মানুষের সেবা করার। সেবার এই মানসিকতা থেকেই তিনি একসময় চলে আসেন সাংবাদিকতায়।

সাংবাদিকতা ছিলো মূলত তাঁর পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্যিক ধারা। সেই ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য তিনি প্রথমত প্রবেশ করেন সাংবাদিকতা জগতে।

সাংবাদিকতার জন্য তিনি আশাশুনি থেকে চলে আসেন খুলনা শহরে। খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক কালান্তর পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা ও লেখালেখি শুরু করেন শেখ আবুল কাসেম মিঠুন। দুর্বার গতিতে চলতে থাকে তাঁর লেখালেখি ও সংবাদপত্রের নানাবিধ কাজ। তিনি পত্রিকার বিষয়াদি নিয়েই সকল সময় ব্যস্ত থাকতেন।

নিজেকে একজন সফল সাংবাদিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর মেধা ও মননের কারণে।

তিনি তখন ছিলেন একজন সফল সাংবাদিক। আসলে তিনি সাংবাদিকই হতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল।

শেখ আবুল কাসেম মিঠুন ১৯৭৮ সালে খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক কালান্তরে লেখালেখির মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন সেকথা আগেই জেনেছি। দৈনিক কালান্তরের পর সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ পত্রিকার তিনি হয়েছিলেন সাহিত্য সম্পাদক। এরপর দৈনিক আবর্তন পত্রিকার

www.pathagar.com

সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

একসময় খুলনা ছেড়ে ঢাকায় আসেন শেখ আবুল কাসেম মিঠুন।

শেখ আবুল কাসেম মিঠুন ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে যেমন নম্র, ভদ্র এবং সৎ মানুষ, তেমনি চেহারাও ছিলেন অনেকটা রাজপুত্রের মতো। যেমন স্বাস্থ্য তেমন উচ্চতা আর তেমনি ছিলো তাঁর চেহারার উজ্জ্বলতা। সব মিলে এক দশাসই সুন্দর ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

ঢাকায় এসে শেখ আবুল কাসেম মিঠুন বিনোদন সাংবাদিক হিসাবে এফডিসিতে সংবাদ সংগ্রহ করতে যান। সেই সময় তাঁর সুদর্শন চেহারা দেখে মুগ্ধ হন চিত্রপরিচালক হাফিজ উদ্দিন ও আলমগীর কুমকুম। তাঁদের আমন্ত্রণে শেষ পর্যন্ত অভিনয়ে প্রবেশ করেন শেখ আবুল কাসেম মিঠুন। শুরু হয় শেখ আবুল কাশেম মিঠুনের অন্য এক বিচিত্র জীবনপ্রবাহ।

সাংবাদিক থেকে নায়ক! সে কী কম কথা! তাও আবার রূপ কথার রূপালি পর্দার!

১৯৮০ সালে বজলুর রহমান পরিচালিত 'তরুলতা' নামক চলচ্চিত্রে তিনি প্রথম অভিনয় করেন। এরপর তিনি অভিনয় করেন বহু সুপারহিট চলচ্চিত্রে। ১৯৮২ সালে শেখ নজরুল ইসলাম পরিচালিত 'ঈদ মোবারক' চলচ্চিত্রে নায়ক হিসাবে অভিনয় করেন। পরে 'ভেজা চোখ', 'গৃহলক্ষ্মী', 'নরম-গরম', 'সারেন্ডার', 'নিঃস্বার্থ', 'বাবা কেন চাকর', 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না', 'নিকাহ', 'গাড়িয়াল ভাই', 'রঙ্গিলা', 'ভাগ্যবতী', 'ধনবান', 'কুসুম কলি', 'ভেজা চোখ', 'অর্জন', 'ত্যাগ', 'বাদশাহ ভাই', 'জেলহাজত', 'ত্যাজ্যপুত্র'।

শুধু অভিনয় নয়, অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি গানও লিখতেন। একজন ভালো গীতিকার হিসাবে চলচ্চিত্র জগতে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। 'তরুলতা' নামক চলচ্চিত্রে তিনি গীতিকার হিসাবে গান রচনা করেন। তা ছাড়া তিনি খুলনায় থাকতেই খুলনা বেতারে নিয়মিত গীতিকার হিসাবে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

তিনি তৈরি করেছেন বেশ কিছু টেলিফিল্ম, নাটক ও গানের ভিসিডি। প্রচুর লিখেছেন চলচ্চিত্র, নাটক, সংস্কৃতি, মিডিয়াসহ বহুবিধ বিষয়ে।

অর্থাৎ তিনি ছিলেন সকল সময় কর্মব্যস্ত একজন মানুষ। কাজই ছিলো তাঁর নেশা।

www.pathagar.com

এত কাজের মধ্যেও তাঁর মূল আকর্ষণ ছিলো চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনা করা।

লেখালেখি ছিল তাঁর স্বভাবজাত একটি বিষয়। লেখালেখি থেকে তিনি কখনই দূরে থাকতে পারেননি। তিনি নায়কের অভিনয় করলেও সারাক্ষণ মন পড়ে থাকতো কাগজ-কলমের দিকে। যখনই সময় পেতেন তখনই লিখতে বসতেন। লেখালেখিতে তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিলো না। বরং মানসিক তৃপ্তি ছিলো প্রচুর। সেইসাথে ছিলো সামাজিক ও সুস্থ সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি অভিনয়ের পাশাপাশি ক্রমাগত লিখে চলতেন। ভাবা যায়! তিনি চলচ্চিত্রের জন্যই শুধু প্রায় দুই শতাধিক স্ক্রিপ্ট লিখেছেন।

স্ক্রিপ্ট লেখার পাশাপাশি তিনি কয়েকটি চিত্রনাট্যও লিখেছেন। যেমন– মাসুম, অন্ধবধূ, দস্যু ফুলন, স্বর্গ-নরক, জিপসী সর্দার, প্রেম-বিধাতা, কালনাগিনীর প্রেম, আহবান প্রভৃতি।

এসব গুণ ও মেধার কারণে শেখ আবুল কাসেম মিঠুন চলচ্চিত্র জগতে অতি দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। যে কারণে তিনি সেখানকার বহু সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন।

চলচ্চিত্রের কর্মময় জীবনে তিনি ১৯৮৯-৯১ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির প্রচার ও দফতর হিসাবে নির্বাচিত হন এবং শিল্পী সমাজের জন্য বিশেষ অবদান রাখেন।

তিনি ১৯৯৩-৯৫ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির 'আন্তর্জাতিক সম্পাদক' হিসাবে নির্বাচিত হন এবং ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে সম্পর্কোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির পক্ষে ১৯৯৩ সালে মিঠুন জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালার সুপারিশ রচনা করেন, যা তৎকালীন শিল্পী সমিতির নির্বাহী কমিটিতে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়।

১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র লেখক সমিতি গঠনে ভূমিকা রাখেন এবং ২০০০ সালে লেখক সমিতির সহসভাপতি এবং ২০০১ সালে সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

তিনি ২০০২ সালে চলচ্চিত্র শিল্পের সকল সংগঠন মিলে 'ফিল্ম ফেডারেশন' গঠনে গঠনতন্ত্র রচনায় ভূমিকা রাখেন এবং ফেডারেশনের সহমহাসচিব হিসাবে নির্বাচিত হন।

www.pathagar.com

তিনি ১৯৯৪ সালে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির জন্য গঠনতন্ত্র পরিবর্ধনকল্পে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ১৯৮৬ সালে এফডিসিতে অনুষ্ঠিত এক মনোজ্ঞ ঝলমলে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অন্যান্যদের সাথে তাঁকেও বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির পক্ষ থেকে ২০১৪ সালে তাঁকে চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আজীবন সদস্যপদ প্রদান করা হয়।

সাংবাদিকতা, চিত্রনাট্য লেখা, অভিনয় ছাড়াও শেখ আবুল কাসেম মিঠুনের ছিলো সাহিত্যের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ। তিনি প্রচুর পড়তেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার বই-পুস্তক তিনি নিয়মিত পাঠ করতেন। আগেই জেনেছি যে লেখালেখি ছিলো তাঁর স্বভাবজাত বিষয়। সেই ধারাবাহিকতায় তিনি লেখালেখি চালিয়ে যেতেন। তাঁর রচিত '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ নিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত উপন্যাস 'আমরাই' গ্রন্থটি ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'শিক্ষা ও সংস্কৃতির নেতৃত্ব : সঙ্কট ও সংঘাত' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালে। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলো সুধী পাঠক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

শেখ আবুল কাসেম মিঠুন অভিনয় জগতে বিচরণ করেছেন অত্যন্ত স্বার্থকভাবে। বহু ছবিতে অভিনয় করে দর্শকের হৃদয়ে প্রিয় নায়ক হিসাবে স্থান করে নিয়েছিলেন। অভিনয় জগতে থাকতেই তিনি একসময় আলোকিত পথের সন্ধান পান। ব্যাপক পড়াশোনার ফলেই তাঁর এই বোধদয় ঘটে। তিনি বুঝলেন যে, রূপালি পর্দা ও জগতের এই ঝলমলে জীবনই শেষ কথা নয়। চির সত্য হলো আখেরাতের মুক্তি। যখন বুঝলেন তখনই তিনি চলচ্চিত্র জগতের সকল মোহমায়া ত্যাগ করে ফিরে আসেন আলোর পথে। যে পথ চলে গেছে জান্নাতের দিকে।

আলোর পথে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর চিন্তা জগতেও ঢেউ খেলে যায় পরিবর্তনের স্রোত। তাঁর সেই চিন্তার কিছু কিছু ফুলকির সাথে আমাদের পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিস্তারিত জানা যেতে পারে তাঁর প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং লেখা থেকে। যেমন তিনি 'ইসলামি সংস্কৃতির স্বরূপ' প্রবন্ধে বলছেন–

ইসলামি সংস্কৃতির স্বরূপ অল্প কথায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এটা ব্যাপক একটা বিষয়। একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বোধগম্য করে তুলে ধরার চেষ্টা করা যেতে পারে। আমরা স্কুলে একটা রচনা পড়েছি, 'জীবনের লক্ষ্য' বা 'এইম ইন লাইফ'। শিক্ষার্থীরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক,

www.pathagar.com

অর্থনীতিবিদ এমন নানা উদ্দেশ্যের কথা লেখে। বিষয়টি ইসলামি সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। আর এটি মানুষের চিন্তাধারাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করে দেয়। আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষকে এধরনের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে দেখতে চান। তাই আল্লাহ নিজেই মানুষকে শিখিয়ে দিয়েছেন,'কুল ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহী রজিউন'। -বলো আমি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি এবং আল্লাহর কাছে ফিরে যাব। এই আয়াতটি সকল প্রকার চিন্তার সংকীর্ণতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন করে তার কাছে ফিরে যাওয়া।

এখানে দেখা যাচ্ছে মানুষের উদ্দেশ্য ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া নয়। তাহলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে চাওয়ার একটা পরিভাষা দরকার। সেটা হতে পারে 'বাহন' অথবা 'মাধ্যম'। অথবা হতে পারে 'আমি কি হতে চাই বা কি করতে চাই'। যদি ভাবধারাটা এমন হয় যে, একদিন আমি আল্লাহ'র কাছে ফিরে যাব এবং আমার মাধ্যম হচ্ছে 'ডাক্তারী'। তাহলে ডাক্তারী পেশাটা আমার কাছে অত্যন্ত সততাপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ সেবামূলক একটা পেশা হয়ে ওঠে। এই পেশার সততাই আমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে তার কাছে নিয়ে যাবে। আমি যদি বৈজ্ঞানিক হই তবে আমি এ্যটম বোমা বানাবো মানুষ হত্যার জন্য নয়, কারণ তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির বদলে প্রচণ্ড ক্রোধ আছে।

অতএব আমাকে এটম বোমা বানাতে হবে মানুষের কল্যাণের জন্য, তা হলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো, না পারলে বানাবোই না। এটাই ইসলামি সংস্কৃতি শুধু নয় ইসলামেরও মৌল ভিত্তি এবং সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। কাজ হচ্ছে বাহন, কাজ কখনো উদ্দেশ্য নয়। কাজগুলোকে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সম্পন্ন করলেই আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই হচ্ছে বুদ্ধিমান মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আরো ভালোভাবে ইসলামি সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝার জন্য আমি পাঠককে অনুরোধ করবো 'ইসলামি সংস্কৃতির মর্মকথা'- মাওলানা মওদূদী [রহ]-এর লেখা এই বইটি পড়ার জন্য। এই বইয়ের মূল বক্তব্য যা, আধুনিক সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞরা তাদের লিখিত পুস্তকে তাদের ভাষায় ঐ একই বক্তব্য লিখে গেছেন। যেমন গাস্ত রোবের্জ, ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য, সোমেন ঘোষ, ধীমান দাশগুপ্ত প্রমুখ সাংস্কৃতিক গবেষক।

www.pathagar.com

কী চমৎকার বিশ্লেষণ!

তিনি 'মহানবী (সা) ও বিশ্বসংস্কৃতি' সম্পর্কে আমাদের এভাবে ধারণা দেন যে–

মহানবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির সূচনা থেকে আজ অবধি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে কলেমা তৈয়াবা এবং ঈমান থেকে উদ্ভূত সংস্কৃতিক রূপরেখা। যে খ্রিষ্টধর্ম বিকৃত হয়ে গেছে, পুরোহিতদের গির্জাকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা যা সমস্ত ইউরোপকে দোজখ সমতুল্য করে ফেলেছিল সে বিকৃত কর্মও সংশোধিত হয়েছ ইসলামের পরশে। গির্জাকেন্দ্রিক অত্যাচার তিরোহিত হয়েছে।

বাথরুম ব্যবহার, ঘরে প্রবেশের অনুমতি এবং সেচব্যবস্থা, হাসপাতাল ইত্যাদি থেকে শুরু করে মানুষের জীবনের সমস্ত দিকগুলোতে যে কল্যাণময়তার স্বরূপ সমস্ত পৃথিবীতে আমরা দেখেছি তা ইসলামেরই অবদান। আর যত অকল্যাণ তা সবই পৌত্তলিক, শিরক উদ্ভূত এবং নাস্তিকতা থেকে সৃষ্ট।

পরিবার ব্যবস্থা, পিতামাতার অধিকার, স্ত্রীর অধিকার, সন্তানের অধিকার, এতিম ও বৃদ্ধদের প্রেমময় নিরাপত্তা– তথা দুর্নীতির উচ্ছেদ, মানব-সেবা, বৈধ-অবৈধ পন্থার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, ভালো মন্দের স্বরূপ, এ সবই ইসলামের দেখানো– মহানবী (সা) আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে আরবদের কাছে সাহস, আত্মমর্যাদা ইত্যাদি কি অর্থ বহন করতো। সমস্ত দুনিয়াবাসীর কাছে প্রত্যেকটি সদগুণের অর্থ এভাবে কদর্য পন্থায় ব্যবহৃত হতো। আজ যেমন আমাদের দেশের মিডিয়া বা চলচ্চিত্রে যে অশ্লীলতা তা বাম ও রামদের কাছে শ্লীল। যা গোপন ব্যবহারে সুন্দর রাম-বামরা তা প্রকাশ্যে ব্যবহার করে। যা সাধারণভাবে লজ্জার বিষয় তা বাম ও রামদের কাছে লজ্জাই নয়। লগি-বৈঠা দিয়ে প্রকাশ্যে হত্যাযজ্ঞ তারা সমর্থন করে। তিল তিল করে গড়ে তোলা কোন সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান কলমের কয়েকটি খোঁচায় তারা কলঙ্কিত করে দিচ্ছে। তারা অপরাধীর শাস্তির কথা বলেছে কিন্তু যে আইন ব্যবস্থা অপরাধী তৈরি করে সেই আইনব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা বলছে না। কারণ তারা জানে কোন আইন-ব্যবস্থা অপরাধ ও অপরাধী নির্মূল করে। আর জানে বলেই তারা ইসলামের আইন ব্যবস্থাকে ব্যান্ড করার পাঁয়তারা করেছে। কারণ তারা চায় অপরাধী তৈরির কারখানাটি থাকুক, তবেই তাদের রাজত্ব স্থায়ী থাকবে। এসবই পনের শত বছরের পূর্বেকার

www.pathagar.com

পৌত্তলিক ও জাহিলি সমাজের চিন্তধারা। তারাই 'ভাস্কর্য' নামের মূর্তি ব্যবস্থা জারি রেখেছে। ইন্দ্র যেমন রাজা অশ্বরীশকে তার মূর্তির বেদিতে ফুল ছড়াতে বলেছিল রাম ও বামরা সে ব্যবস্থা চালু রেখেছে। এসব কিছুই অজ্ঞতা থেকেই সৃষ্ট। এর ফলে হচ্ছে শিরকবাদিতা। মূর্তি পূজা থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার পূজা, ব্যক্তি পূজা, নফসের পূজা, ক্ষমতাধর ব্যক্তির পূজা (যা থেকে ঘুষ প্রথার সৃষ্টি) নিজস্ব স্বার্থের পূজা সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

আজকের বিশ্বসংস্কৃতির যত কল্যাণময় রূপ তা মহানবীর (সা) দেখানো পথ ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্রুসেডের যুদ্ধ এসে ইউরোপীয়রা ইসলামের অনেক কিছুই গ্রহণ করে নিজেদের দেশে প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই বলা হয় ইউরোপে ইসলাম আছে কিন্তু মুসলমান নেই। অর্থাৎ তাদের আইন ব্যবস্থার বেশিরভাগই ইসলাম থেকে নেয়া।

বিশ্বসংস্কৃতির যে কল্যাণময় উজ্জ্বল দিকগুলো প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মহানবীর (সা) সাহাবী (রা), পরবর্তীকালের তাবেঈ, তাবে-তাবেঈন ও আলেম-উলামা এবং মুসলিম সৈনিকরাই তার বাহক।

মহানবীর (সা) উম্মত হিসেবে আল্লাহ ঘোষিত শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে আজ আমাদেরকে আমাদের সমস্ত তৌহিদী জ্ঞান নিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে হবে–শুধুমাত্র পরকালে আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার আশায়– আল্লাহ সেই তৌফিক আমাদের দান করুন।

তিনি মনে করতেন, অজ্ঞতা ও অশিক্ষার ফলে মানুষ অন্তর্নিহিত সত্যের দিকে ধাবিত না হয়ে প্রকাশমান রূপে ঝলক ও চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তা অনুসরণ ও অনুকরণ করে। সত্যের দিকে অগ্রসর না হওয়ার কারণে মানুষ অত্যধিক কল্পনাপ্রবণ, সংকীর্ণ মানসিকতা এবং স্বার্থান্ধ হয়ে ওঠে। আর এই দোষগুলোর ভিত্তি হলো অহংকার। অহংকার মানুষকে স্বার্থ উদ্ধারকারী ব্যক্তিকে পূজা করতে শেখায় এবং যে স্বার্থ উদ্ধারকারী নয় সে যতই সত্যপথের পথিক হোক বা মহামানব হোক তাকে তারা সহ্য করতে পারে না।

অজ্ঞতা এবং অশিক্ষার কারণে মানুষ যাতে পথভ্রষ্ট না হয়, হানাহানি না করে, ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী না হয় সে জন্য আল্লাহতাআলা প্রথম সৃষ্ট মানুষকে নবী হিসেবে সৃষ্টি করেছিলেন। নবীর মাধ্যমে অজ্ঞতা দূর করে করণীয় কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অবহিত করেন। প্রথম মানুষ আল্লাহর নবী হযরত আদম (আ) কে দুনিয়াতে পাঠাবার সময়েই আল্লাহ

www.pathagar.com

বলেছিলেন– "আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও, তবে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে (আইন ব্যবস্থা সম্পর্কিত) হেদায়াত আসবে, অতঃপর যে আমার বিধান মেনে চলবে তার কোন ভয় নেই, তাদের কোনো প্রকার উৎকণ্ঠিত হতে হবে না। আর যারা (আমার আইন কানুন) অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন (করে লাগামহীন জীবন যাপন) করবে তারা অবশ্যই জাহান্নামের বাসিন্দা হবে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।" (সূরা আল-বাকারাহ : ৩৮-৩৯)

এইভাবে আল্লাহতায়ালা দুনিয়াতে মানুষ পাঠিয়ে তাঁর হেদায়েত দিয়ে মানুষের অজ্ঞতা দূর করেছেন। অজ্ঞতা ও অশিক্ষা একটি অভিশাপ-একটি ভয়াবহ মারাত্মক অপরাধ। এখানে অজ্ঞতা ও অশিক্ষা বলতে এটা নয় যে, "আমি ডাক্তারি বিদ্যা জানি না তাই আমি অভিশপ্ত বা অপরাধী। অথবা আমি দীর্ঘ জীবন একজন পারিবারিক সদস্য হয়েও রন্ধনপ্রণালী জানি না তাই আমি অভিশপ্ত বা অপরাধী।' বিষয়টি মোটেই তা নয়। অজ্ঞতা ও অশিক্ষা হচ্ছে এমন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও জ্ঞান থাকলে মানুষ আর অজ্ঞ থাকে না। তার অন্তর্লোক কষ্টিপাথরের মতো সঠিক স্বর্ণ চিনে নিতে পারে। অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত বস্তুগত সমাহারে সে নিজের চিন্তা ও কর্মকে কিভাবে পরিচালিত করবে সে বিষয়ে জ্ঞান। সেই জ্ঞানই মানুষকে সঠিক পথে চলার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে দেয়। সঠিক মানুষ চেনার মনশ্চক্ষু খুলে দেয়। হযরত আলী (রা) বলেছেন ''কোন বস্তু বা মানুষকে দিয়ে সত্য বিচার করো না, আগে সত্যকে জানো সঠিক বস্তু বা সঠিক মানুষ আপনাতেই তোমার চোখে ভাস্বর হয়ে উঠবে।" সেই জ্ঞান হচ্ছে (ক) মানুষের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক কি ! অর্থাৎ তৌহিদ সম্পর্কে জ্ঞান। (খ) পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা কি, সৃষ্টিকর্তা কি কি কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করেছেন, সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, এসব জ্ঞান নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা শিক্ষা দিয়েছেন, অর্থাৎ রিসালাত সম্পর্কে জ্ঞান। (গ) এই পৃথিবীতে মানুষ যে সব চিন্তাপদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে এবং তারই আলোকে কর্ম সম্পাদন করবে মৃত্যুর পর স্রষ্টা তারই আলোকে বিচার ফায়সালা করবেন। মানুষ তখন ভালো কাজের ভালো ফল, খারাপ কাজের খারাপ ফল পাবে। অর্থাৎ আখেরাত সম্পর্কে জ্ঞান। তৌহিদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা মানুষের জন্য ফরজে আইন। পৃথিবীর বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষকে আল্লাহতায়ালা উক্ত জ্ঞান অর্জন করার কঠোর তাগাদা দিয়েছেন। এই জ্ঞান অর্জন না করলে মানুষ তার কাজ কর্মে ভুল করবে, ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে,

www.pathagar.com

স্বার্থান্ধ হবে, অন্য মানুষকে অমানবিক ভাবে ব্যবহার করবে, বস্তুর অকল্যাণকর ব্যবহার করবে এবং নৈতিক চরিত্র হারিয়ে অপরাধী কর্মে লিপ্ত হবে। তাই ফরজে আইন বিষয়ক উক্ত জ্ঞান অর্জন করতেই হবে। নবী-রাসূলদের উম্মতগণ উত্তরাধিকার সূত্রে উক্ত জ্ঞানে সমৃদ্ধ। তাই অন্যের কাছে এই জ্ঞান কথার মাধ্যমে লেখনীর মাধ্যমে এবং আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া মুসলমানদের জন্য ফরজে আইন। যাদের কাছে উক্ত জ্ঞান আছে এবং সরল বিশ্বাসে খুশিমনে যারা তা মান্য করে ও পালন করে তারাই মুসলমান নামে অভিহিত। আল্লাহতায়ালা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছেন– "এখন দুনিয়ার সেই সর্বোত্তম দল তোমরা যাহাদিগকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে, তোমরা ন্যায় ও সৎকাজের আদেশ করো, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখিয়া চলো।"– মুসলমানরাই আল্লাহর দেয়া আইন বিধান প্রতিষ্ঠা করে দুনিয়াতে কল্যাণ স্থাপন করতে পারে। অন্য মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা অথবা তৌহিদ রিসালাত ও আখেরাতের খবর পৌঁছে দেয়া প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজে আইন। যাতে কেয়ামতে অপরাধী ব্যক্তি বলতে না পারে যে উক্ত জ্ঞান তো আমাদের কাছে ছিল না তাই আমরা অপরাধ করেছি।" (সূরা আলে ইমরান-১১০) আল্লাহতাআলা এ বিষয়টিও পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন– "আল্লাহ তায়ালা নবীদেরকে সুসংবাদ প্রদানকারী এবং পরিণতির ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছেন, যাতে করে মানুষ তার কাছে এরূপ বিতর্ক তোলার সুযোগ না পায় যে আমরা তো বেখবর ছিলাম। আর আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই প্রবল পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আন-নিসা-১৬৫)

এখন সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে মানুষকে সুষ্টি করে পৃথিবীর বুকে অন্ধকারে আল্লাহ ছেড়ে দেননি বা ফেলে রাখেননি। তাকে সঠিক পথ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, তার মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করেছেন, তার করণীয় সম্পর্কে জ্ঞাত করেছেন। প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সা) পর্যন্ত যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা নবী পাঠিয়ে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) শেষ নবী হওয়ার তাৎপর্য তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন-"পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে আমার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে একটি সুরম্য পূর্ণাঙ্গ ও সুশোভিত প্রাসাদ নির্মাণ করলো কিন্তু একটি ইটের স্থান পরিত্যক্ত (অসম্পূর্ণ রেখে) দিল। জনতা প্রাসাদটি প্রদক্ষিণ করতো এবং তাতে বিস্মিত হয়ে বলতো

www.pathagar.com

তার নির্মাতা যদি ঐ ইটের স্থানটি পূর্ণ করতো। অতএব আমি নবীগণের মধ্যে সেই ইটের স্থান সমতুল্য।"-উবাই ইবনে কাব (রা) বর্ণিত।

অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতার উন্মেষ ঘটে গেছে, আবর্তন ও বিবর্তনের মাধ্যমে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতিক স্বরূপ একটা নির্দিষ্ট অবয়ব পেয়েছে। শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট আইন ও নীতি নিয়মের অধীনে একটি কল্যাণময় পৃথিবী তৈরি করতে হলে হযরত মুহাম্মদ (সা) আনীত কোরআন এবং তার দেখানো পথ অনুসরণ করলেই তা সম্ভব। আর নতুন কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব হবে না সেটা নয় তবে যা-ই ঘটুক তা কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতেই সঠিক পথে চালনা করা সম্ভব। বর্তমান পৃথিবীর রাজনীতি অর্থনীতি ও সংস্কৃতির স্বরূপ বিচার করতে হলে নবীর (সা) আগমনের প্রাক্কালে পৃথিবীর রাজনীতি অর্থনীতি ও সংস্কৃতির রূপ কেমন ছিল তা আমাদের সামনে থাকা দরকার। স্মরণ রাখা দরকার যে আল্লাহ তাআলার পাঠানো নবী ও রাসূলরা যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছেন তা মানুষ এক সময় বিকৃত করে ফেলেছে, জনপদ আবার অকল্যাণের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে, তখনই আল্লাহ তাআলা নবী পাঠিয়েছেন, এইভাবে লক্ষ লক্ষ নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে। আর তাদের আনীত আইন ব্যবস্থাও বিলুপ্ত হয়েছে। শেষ নবী (সা) যখন আগমন করেন তখন সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ছিল এব বিকৃতির শিকার। পরিবার সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ ব্যবস্থা, বুদ্ধিবৃত্তি এবং সংস্কৃতি ছিল অমানবিক ও অশ্লীল পন্থার অনুসারী। আজকের পৃথিবীতে যত জনগোষ্ঠী বিদ্যমান তাদের মধ্যে যতটুকু কল্যাণ ও মানবিক সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করা যায় তা একমাত্র ইসলামেরই অবদান এটা অকাট্যভাবে সত্য। শেষ নবী (সা) আনীত জ্ঞান উপযুক্ত মানুষের মাধ্যমে সার্বিকভাবে অর্থাৎ সত্যিকার মুসলমানদের ছাড়া কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে পৌঁছানোর অব্যাহত চেষ্টা থাকবে বলেই নতুন করে নবী পাঠানোর কোন যুক্তি থাকে না, আর তাই কোন নবীর আগমন ঘটবে না।

'ইসলামি চলচ্চিত্র আন্দোলন' সম্পর্কে শেখ আবুল কাসেমের স্পষ্ট বক্তব্য ছিলো এরকম–

চলচ্চিত্র আবিষ্কার এবং প্রদর্শনীর সময়টাতে উপমহাদেশে [সমগ্র বিশ্বেও] মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। খ্রিষ্টান ও বর্ণবাদী ব্রাহ্মণদের শাসন হিন্দুদের উপর খ্রিষ্টান শাসকের পক্ষপাতিত্ব এবং সর্বস্তরে শোষণ, বঞ্চনার মধ্য দিয়ে মুসলিম জাতিকে ধ্বংসের প্রায় শেষ সীমানায়

www.pathagar.com

পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। মুসলিম জাতি তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, আত্মসমৃদ্ধির দরজায় তার কোনোভাবে উঁকি দেবার সুযোগ ছিল না।

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা-দীক্ষা, উচ্চশিক্ষা এবং বিভিন্ন প্রকার গবেষণা থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠী সরে গিয়ে বিভিন্ন পীর সাহেবের খানকায় গিয়ে শিষ্যত্বের চাদরে আত্মগোপন করে। তখন যত পীর ততভাগে মুসলিম জনগোষ্ঠী বিভক্ত হয়ে পড়ে।

অথচ এই সময়টিতে উপমহাদেশের হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী তাদের বৈষয়িক এবং মানসিক সংস্কৃতির ব্যাপক উত্তরণ ঘটায়।

চলচ্চিত্র ১৯২৭ সাল অবধি ছিল নির্বাক। ১৯২৭ সাল থেকে চলচ্চিত্রে প্রথম শব্দ প্রয়োগ পদ্ধতির শুরু হয়। নতুন মাত্রা পেয়ে চলচ্চিত্র একক, বৃহত্তম বাণিজ্যিক বিনোদন মাধ্যম হিসেবে উপমহাদেশে ঠাঁই করে নেয় এবং দর্শকদের সামনে বিনোদনের বিপুল উপাদান নিয়ে প্রতি মুহূর্তে হাজির হতে থাকে। বিভিন্ন রাজ্যের রাজা, রাজপুত্র এবং জমিদার শ্রেণি চলচ্চিত্র ব্যবসায় অর্থ লগ্নি করতে থাকে। তারা গড়ে তোলে স্টুডিও, ল্যাবরেটোরি, স্যুটিং স্পট। নতুন নতুন প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হয় উপমহাদেশের প্রায় সব শহরে।

অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত- দলছাড়া, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিষ্পেষিত অথচ প্রতিভাদীপ্ত মুসলিম সাহিত্যিক, কবি, গীতিকার, সুরস্রষ্টা, পরিচালক এবং অভিনয় শিল্পীরাও তাদের সমস্ত পাণ্ডিত্য, মেধা, প্রতিভা, চেষ্টা ও শ্রম দিয়ে অনৈসলামিক পন্থায় এবং শিরক ও জাহেলিয়তের চূড়ান্ত সব সৃজনশীলতার জোগান দিতে থাকে, সমৃদ্ধ করতে থাকে জাহেলিয়তের ধ্বজাধারী উপমহাদেশের একমাত্র বিনোদন মাধ্যম চলচ্চিত্র শিল্পকে। এক পর্যায়ে মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগত গড়ে ওঠে–এম, বশির মাহমুদ সাহিত্নরত্ন, রাজা মেহেদী আলী খাঁন, জানেসার আখতার, রফিক গজনবী, শাকিল বাদাউনি, নৌশাদ, ইসমাত চুগতাই, আনোয়ার কামাল পাশা, আখতার শিরানী, মেহবুব খান, কে আসিফ, খাজা আহম্মদ আব্বাস, কামাল আমরোহীদের মত মুসলিমদের অমুসলিমপন্থায় জ্ঞানের ব্যবহারে এবং সহযোগিতায়।

মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিভাদীপ্ত কবি-সাহিত্যিকরা তাদের নিজস্ব জীবন বিধান তথা পবিত্র কোরআন, হাদিস, সুন্নাহ্ এবং তাদের আপন সংস্কৃতিকে পাশ কাটিয়ে জাহেলিয়ত এবং শিরকবাদকে সমৃদ্ধ করেছে। ভুলে গেছে জাতি হিসেবে তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে পীর সাহেবরা একজনের মুরীদ হলে আর এক পীরের মুরীদ হওয়া জায়েজ নয় এই ফতোয়া জারী করে বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বিভক্ত করে বিভিন্ন পীরের দলে এবং তাদের খানকায় আবদ্ধ করে রেখেছে। এই ফাঁকে ওই সব মুসলিম কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা অসংগঠিত অবস্থায় তাদের প্রতিভা উজাড় করে দিয়ে শক্ত করেছে শিরক ও জাহেলিয়তের শিকড়। শিরি-ফরহাদ, লাইলী-মজনু, হাতেম-তাঈ, সোহরাব-রুস্তম–এর গায়ে শ্রীকৃষ্ণ-রাধার অবৈধ-অশ্লীল প্রেমের রঙ ছড়িয়ে সে সব কাহিনিকে বিভিন্ন শাখায় বিচিত্র সব উপাদানে ভরপুর করে একের পর এক সব চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে, তৈরি হয়েছে সংগীত। যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে অবৈধ প্রেম উদ্বুদ্ধকরণে এবং অবৈধ সম্পর্ক উৎসাহিতকরণে।

উক্ত দুটি মূল লক্ষ্যকে পুঁজি করে হাজার হাজার চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ গান তৈরি হয়েছে। যার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো অবৈধ প্রেম ও অবৈধ সম্পর্ক উৎসাহ প্রদান। সব চলচ্চিত্র ও সংগীত উৎসাহিত ও সমর্থন করেছে হিন্দু পৌরাণিক প্রেম-কাহিনির মূল বিষয় অবৈধ প্রেম ও অবৈধ সম্পর্ক।

সমগ্র মুসলিম জাতি তাদের মন-মস্তিষ্কে এবং চিন্তায়-চরিত্রে ঐ একই ভাবধারার প্রলেপ মেখে বিভ্রান্ত হয়েছে। এইভাবে মুসলিম তরুণদের ও প্রতিভাবানদের চিন্তা-চেতনা থেকে সৃজনশীলতা লুপ্ত হয়েছে। আর চলচ্চিত্র নামক আধুনিক বিজ্ঞানের অবদানকে এবং তার বাস্তবতাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে নিজেদের সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্যতম সিংহদরজাটি চিরতরে তালাবদ্ধ করে রেখেছে।

এমতাবস্থায় একটা বিশাল মিথ্যার পাথর চাপা দেবার প্রচেষ্টা চলেছে যা আজও চলছে, তাহলো এই যে, ইসলাম মানুষের চিন্তার বিকাশ ঘটতে দেয় না বরং নানান বাধ্যবাধকতা আরোপ করে ইসলাম মুসলিম জাতির মননশীলতা, চিন্তা-ভাবনা এবং চেতনাকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। এই অপবাদ আরোপের আরো কারণ হলো- চলচ্চিত্রের সেই উৎকর্ষের যুগে, পৃথিবীর বেশ কিছু উন্নত দেশে চলচ্চিত্রকেন্দ্রিক ব্যাপক আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়ালো এবং সফল হলো। কিন্তু সেখানে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক বলে দাবি করে তারা অর্থাৎ মুসলিমরাই অনুপস্থিত।

তাঁর বিবেচনায়, চলচ্চিত্রিক ক্ষেত্রে মুসলিমরা তাদের আদর্শ, তাদের চিন্তা-চেতনা, আচার-ব্যবহারের প্রকাশভঙ্গি অমুসলিমদের মত হয়ে গেছে, মুসলিম-অমুসলিম পার্থক্য নেই বললেই চলে। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ

www.pathagar.com

মুসলিমরা তাই আজ 'মুসলিম' শব্দটাকে বাঁকা চোখে দেখে এবং সর্বজনীন নৈতিকতাকে ডিঙিয়ে অমুসলিমদের মতো অমানবিক, স্বার্থপর, মিথ্যাশ্রয়ী ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টিতে একজন মুসলিম হবে দরিদ্র, তার বিশেষ পোশাক থাকবে, সে ইঞ্জিনিয়ার হবে না, নেতা হবে না, বিচারক, গবেষক, ডাক্তার কিছুই হবে না, হওয়া সম্ভবও নয়, কারণ তার ধর্ম তার জীবন ও চিন্তা-ভাবনাকে মসজিদ ও মাদ্রাসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে বলেছে। বিয়ে পড়ানো, আরবি শেখানো, মিলাদ পড়ানো এবং মৃতের জানাজা পড়ানোই তার কাজ।

যদিও ইসলাম সম্পর্কে এই সংকীর্ণ, ভুল, মিথ্যে এবং জঘন্য ইমেজ চলচ্চিত্রের সৃষ্ট নয় বরং চলচ্চিত্র মুসলিমদেরকে এমন রূপেই চিত্রায়িত করে। যা জাহেলিয়তের চিন্তাকে সমর্থন এবং শক্তিশালী করে। কিন্তু মুসলিমদের এই ইমেজ সৃষ্টির জন্য দায়ী কে! এক কথায় এর উত্তর-প্রতিষ্ঠিত মুসলিম নামধারী শাসকরা এবং তাদের শাসকসত্ত্বাকে দীর্ঘস্থায়ী করে থাকে তথাকথিত পীরদের খানকা ও তথাকথিত মাদরাসা শিক্ষা। এদের শিক্ষা হচ্ছে ইসলামের সর্বজনীন আইনগত পন্থা পালনে আর্থিক উন্নয়নকে বাতিল করে সীমাবদ্ধ কিছু মৌখিক কর্মপন্থায় আর্থিক অনুশীলন। অর্থাৎ ধুলা-বালি, ময়লা পরিষ্কারকে প্রাধান্য দেয়া, কিন্তু ওসবের উৎসমূল চিরতরে ধ্বংস করার পথে তারা ধাবিত হয়না। এই কারণে মুসলিম নামধারী ইসলাম বিরোধী শাসকশ্রেণি পীর সাহেব ও সেইসব মাদরাসা শিক্ষিতদেরকে হাতিয়ার করে মনের মত করে ধূলা-বালি ও ময়লা উৎপাদনে অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী বিধান ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি নিয়োগ করার সুযোগ পায়। আর চলচ্চিত্র এই ভাবধারা ও ইমেজকে সমর্থন করে এবং পুষ্ট করে। কায়েমী স্বার্থপূজারী শাসকশ্রেণি তাই ইসলামি বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধেও সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে। চলচ্চিত্রের সর্বাঙ্গে মনস্তাত্ত্বিকভাবে উক্ত বিষয়গুলো নানাপ্রকার মাল-মশলা দিয়ে সাজানো থাকে। সাধারণ মানুষের মনে তা গেঁথে যায় এবং তারাও ঐ একই পথে পরিচালিত হয়, তাদের কাছে ইসলামি বিধান কঠিন মনে হয়। আর এখানেই চলচ্চিত্রের বিপুল ক্ষমতা। অথচ সবারই জানা যে, বিধানকে যথাযথ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় জুলুমকে সমূলে উৎপাটন সম্ভব হয়ে ওঠে। আর রাস্তায় হাটলে ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করা যেমন সহজ হয় তেমনি তা সাহসও সঞ্চার করে, না হেঁটে শুধু মনে জিকির করলে সারা জীবনেও বিধানের রাস্তায় হাঁটার সাহস সঞ্চয় হবে না। শেখ সাদী যথার্থই বলেছেন, 'যে তরবারী দিয়ে ঘাস কাটে সে জীবনেও যুদ্ধ

www.pathagar.com

করার ক্ষেত্রে সাহসী হয় না'। বাস্তবক্ষেত্রেও এটা প্রতীয়মান যে, আমাদের দেশে লক্ষ-কোটি মানুষ তবলীগের বয়ানে বা আখেরী মোনাজাতে অংশ গ্রহণ করলেও আল্লাহর বিধানের বিরোধীতাকারীদের বিরুদ্ধে টু' শব্দ করার হিম্মত হারিয়ে ফেলেছে।

মনে রাখা দরকার চলচ্চিত্র মানুষের মনে নতুন কোনো প্রবৃত্তির সৃষ্টি করে না। চলচ্চিত্র দেখার পর কেউ মন পরিবর্তন করে না। এ পর্যন্ত এমন হয়নি যে চলচ্চিত্র দেখে একজন অহিন্দু হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে। অথবা একজন মুসলমান খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। বা একজন পুজিবাদী কমিউনিস্ট হয়েছে। আমাদেরকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, চলচ্চিত্র নিজে কোনো সংস্কৃতি তৈরি করে না। তাহলে চলচ্চিত্রের কাজ কি! চলচ্চিত্রের সবচেয়ে উলেখযোগ্য কাজ হলো, সে সংস্কৃতির জোগান দেয়। তার লক্ষ্য হলো সে দর্শকের মনের রাজ্যে প্রভাব তৈরি করে। সে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে সমর্থন জোগায়, তার চিন্তাকে বলিষ্ঠ ও বলবান করে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংস্কারগুলোকে জোরদার করে তোলে। যে কোনো অপ্রচলিত বিষযের প্রচলন ঘটায় অথবা অপছন্দের বিষয়কে সহনীয় করে তোলে এবং গ্রহণযোগ্য করে তোলে। অর্থাৎ ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ছাড়াও প্রায় প্রতিটি আইন-বিধানের জায়গায় এখন জাহেলিয়াত স্থান করে নিয়েছে, এখন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয়কে আমরা মানুষের কাছে প্রথমে সহনীয় এবং পর্যায়ক্রমে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারি।

মহানবী [সা] যা বলেছেন তার অর্থ এরকম যে, 'মানুষ তার স্বভাব ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে তার পিতামাতা বা পরিবেশ তাকে কুফরীর পথে ঠেলে দেয়।' তা হলে দেখা যাচ্ছে মানুষের কুফরী চিন্তা-চেতনাকে জাহেলী চলচ্চিত্র শক্তিশালী করছে। অথচ মহানবী [সা] যে চিন্তা নিয়ে উক্ত কথা বলেছেন তা বাস্তবায়নের জন্য ইসলামের অনুসারীদের জন্য চলচ্চিত্র একটা বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সব মানুষই আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী হয়ে জন্মে। কিন্তু নানা মতবাদ, নানা সংস্কৃতি সেটা ঢেকে ফেলে, যার নাম কুফর। চলচ্চিত্রে উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মনের নিভৃতে লুকিয়ে থাকা সেই একত্ববাদকে উসকে দেয়া এবং তাকে তাজা ও জীবন্ত করে তোলা। যাতে 'কুফর' নামক সেই ঢাকনী সরে যায়, মানুষ সঠিক জ্ঞান ফিরে পায় এবং বুঝতে পারে তাকে একদিন আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। মহানবী [সা] সেই শাশ্বত বাণী নিয়েই এসেছিলেন।

www.pathagar.com

অর্থাৎ তাওহীদ, আখেরাত ও রিসালাতের সত্যতা ঘোষণা করাই হবে চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এর মানে এই নয় যে প্রতিটি চলচ্চিত্রে শুধু এই ঘোষণাই দিতে হবে। 'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেললে তাতে সওয়াব হয়'। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের ঘটনাপঞ্জিতে যা থাকবে তা হবে সবই মানব কল্যাণের জন্য। একটা চলচ্চিত্রে হয়তো কোথাও তাওহীদ, আখেরাত কিংবা রিসালাত সম্পর্কে কিছুই বলা হলো না, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার অসঙ্গতি, মানুষের অমানবিক আচরণ অথবা কোন মন্দ বিষয়ের প্রতিবাদও ইসলাম বলে গণ্য হতে পারে। কারণ ইসলামের সকল আদেশ-নিষেধই কল্যাণকর। শুধু শর্ত হলো সকল কাজই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, তাঁরই আদেশ-নিষেধের আওতাধীনে।

অতএব এখনই সময় ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত প্রকৃত মুসলিম, প্রতিভাবান, আগ্রহী, মেধাবী ও পরিশ্রমী তরুণদের সংগঠিত করে চলচ্চিত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা। উপমহাদেশের বাঙালি মুসলিমদের সৌভাগ্য আজ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পবিত্র কোরআনের তফসীর বিশ্ববিখ্যাত 'তাফহীমুল কোরআন', 'জিলালীল কোরআন', সিয়াহ সাত্তাহ'র হাদীসগ্রন্থাবলী, মুসলমানদের শৌর্যবীর্যের ইতিহাস, অমুসলিম ইতিহাসবীদদের অনুবাদকৃত মুসলমানদেরকে নিয়ে মিথ্যা ও বিকৃত ইতিহাসের প্রমাণিত গ্রন্থ 'চেপে রাখা ইতিহাস', ইতিহাসের ইতিহাস', ছাড়াও ইসলামি সাহিত্য-সংস্কৃতির বিপুল সম্ভার এখন হাতের কাছে। ঈমান, ইসলাম, নামাজ-রোজা, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ, তৌহিদ, রিসালাত, অখেরাত, সমাজ-রাষ্ট্রগঠন, ইসলামি সংবিধান, বিচার-ব্যবস্থা, অর্থনীতি, মোট কথা জীবন ও আধুনিক পৃথিবীর সর্ব বিষয়ে ইসলামের জ্ঞান, আদর্শ ও নীতি-বিধান সম্বলিত বই-পুস্তক পড়ে ইসলামের সঠিক রূপরেখা জানবার ও বুঝবার সুযোগ বর্তমান। তদুপরি ইসলামি সংস্কৃতির মৌলিক গ্রন্থ 'ইসলামি সংস্কৃতির মর্মকথা' চলচ্চিত্র আন্দোলনকারীদের নতুন পথের দিশা দিবে।

যতই পৃথিবী আধুনিক হচ্ছে ততই প্রমাণিত হচ্ছে ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য সমস্ত মত ও পথ সংকীর্ণ, ভ্রান্ত এবং অমানবিক। ইসলাম বিরোধী সমস্ত মত ও পথের অঙ্গজুড়ে আত্মস্বার্থ, নিষ্ঠুরতা, আত্মরম্ভিতা, অবৈধ স্বার্থগত পশুসুলভ প্রেম এবং অবৈধ যৌনাচার ভোগ। ইসলাম বিরোধী সমস্ত জ্ঞান, তত্ত্ব এবং অর্জন মিশে যায় ঐ কলঙ্কিত অকল্যাণকর, মনুষ্যত্বহীন শিকড়ে। যার থেকে উৎপন্ন জাহেলিয়াতের গাছের ছায়ায় শীতলতা নেই, আছে অস্থির অমানবিক স্বার্থগত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

www.pathagar.com

এখন সময়ের তরঙ্গে নিত্য নতুনভাবে প্রমাণিত হচ্ছে একমাত্র ইসলামেই রয়েছে চিন্তারাজ্যের বিশাল ব্যাপকতা এবং চিন্তার সঠিক ও সর্বোত্তম বিকাশের মাধ্যমই ইসলাম। অথচ যে চলচ্চিত্র মনুষের দৈনন্দিন আচরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো তুলে ধরে সেই বাস্তবতাকে মুসলমানেরা এতবছর ধরে অস্বীকার করে এসেছে। সেই সুযোগে প্রবল শক্তিমত্তা নিয়ে অগ্রগামী হয়েছে এমন সব চলচ্চিত্র যা ইসলামের আদর্শকে দুর্বল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক ভূমিকায় কাজ করে চলেছে। বর্তমানে ইরাণি চলচ্চিত্র বিশ্বকে তাক লাগিয়ে ইসলামি আদর্শকে সমুন্নত করার কাজে ব্রত।

যাই হোক এখনই প্রয়োজন চলচ্চিত্র শিক্ষার। সময় অনেক পার হয়ে গেছে। তাই প্রয়োজন চলচ্চিত্র আন্দোলনের। ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম তরুণরা যথার্থ সুষ্ঠু নিয়মের অধীনে চলচ্চিত্র-শিক্ষালাভ করতে পারলে একটা শক্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। সে আন্দোলন শুধু বাংলাদেশে নয়, উপমহাদেশে এবং সমস্ত পৃথিবীতে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কল্যাণময় চিন্তার ব্যাপক বিকাশ ও প্রকাশ সম্ভব। জন্মলগ্ন থেকেই চলচ্চিত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। কিন্তু সেখানে মুসলিমরা অনুপস্থিত। কেন অনুপস্থিত তার নানান কারণ ছিল। এই প্রবন্ধের একপর্যায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। এবার উপমহাদেশে চলচ্চিত্র আন্দোলন প্রসঙ্গে আলোকপাত করছি।

প্রথাগত ধারার বিপরীতে অর্থাৎ বিপরীত স্রোতে চলতে গেলে অবশ্যই মেধা, শ্রম এবং ইচ্ছাশক্তিকে পূর্ণরূপে প্রয়োগ করতে হবে। হতে হবে সাহসী। সঠিক পথে চলার জন্য সমষ্টিগতভাবে একটি আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। শিল্পের আলোচনায় বেরিয়ে আসবে আমাদের কি করণীয় এবং পথের রূপরেখা কি।

তথাকথিত সেক্স, ভায়োলেন্স এবং অশ্লীল ছবির বিরুদ্ধে নতুন ধারার ছবি নির্মাণ এবং প্রদর্শনের জন্য ভারতে প্রথম চলচ্চিত্র সংসদ গঠিত হয় কলকাতায় ১৯৪৭ সালে। নাম ছিল,'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি'। প্রতিষ্ঠা করেন সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রমুখ। আমাদের দেশে প্রথম চলচ্চিত্র সংসদ গড়ে ওঠে ১৯৬৩ সালে। সমাজ সচেতন কিছু তরুণ চলচ্চিত্র প্রেমীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই চলচ্চিত্র সংসদের নাম ছিল, 'পাকিস্তান ফিল্ম সোসাইটি'। স্বাধীনতার পর এর নাম হয় 'বাংলাদেশ ফিল্ম সোসাইটি'।

www.pathagar.com

চলচ্চিত্র আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত কিছু বোদ্ধা চলচ্চিত্র কর্মীকে দলবদ্ধ হওয়া এবং একটি গোষ্ঠী গঠন করা। যেটা সংসদ হিসেবে পরিচিত। এধরনের কিছু তরুণ ১৯৬৯ সালে আর একটি চলচ্চিত্র সংসদ গড়ে তোলে যার নাম 'ঢাকা সিনে ক্লাব'। এরপর বহু চলচ্চিত্র সংসদ গড়ে ওঠে বাংলাদেশে। এইসব চলচ্চিত্র সংসদ শিক্ষিত তরুণ শ্রেণিকে চলতি নিম্নরুচির চলচ্চিত্রের বিপরীতে বিকল্পধারার বক্তব্যধর্মী নান্দনিক চলচ্চিত্র দেখতে ও বুঝতে উৎসাহিত করে এবং সেই ধরণের মানসিকতা গঠনে ভূমিকা রাখে। এটা মূলত একরকম দাওয়াতী কার্যক্রম।

সংসদগুলোর কার্যক্রম ছিল, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বক্তব্যধর্মী ক্লাসিক চলচ্চিত্রগুলো সংগ্রহ করা, সেইসব চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমাজ সচেতন দর্শক গড়ে তোলা এবং সদস্যদেরকে চলচ্চিত্র নির্মাণ, চিত্রনাট্য লিখন পদ্ধতি এবং সংলাপ রচনা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলা। চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় সমৃদ্ধ ম্যাগাজিন প্রকাশ করা, ঢাকার বাইরে বিভিন্ন মফস্বল শহরেও তারা তাদের শাখা সংগঠন তৈরি করে এবং মফস্বলের তরুণদেরকে তাদের ভাষায় সুস্থ চলচ্চিত্রের প্রতি উৎসাহিত করে তোলে। সেই প্রক্রিয়া আজো অব্যাহত। [প্রবন্ধ লেখক ছাত্রজীবনে এই ধরনের একটি সংসদের শিক্ষার্থী হয়ে সুস্থ চলচ্চিত্র বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন, যদিও বাস্তবের নির্মমতায় প্রচলিত ও প্রথাগত চলচ্চিত্রের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন।]

চলচ্চিত্র সংসদ প্রতিষ্ঠা করে আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ সচেতন চলচ্চিত্রকর্মীরা যে অগ্রগতি সাধন করেছে তার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে তারাই স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি নির্মাণ এবং পরবর্তীতে পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি, প্রচারধর্মী, বিজ্ঞাপন-চিত্র, তথ্যচিত্র নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেরও আয়োজন করেছে এবং করছে। চলচ্চিত্র সংসদ কর্মীদের দাবির মুখে বাংলাদেশ সরকার 'ফিল্ম আর্কাইভ' গঠন করে। তাদেরই অনুরোধে পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সতীশ বাহাদুর এই প্রতিষ্ঠানের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন। সেখানে অনিয়মিত হলেও ফিল্ম বিষয়ে প্রশিক্ষণের কাজও হয়েছে।

এসবের বিপরীতে বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাদের অনুসারী তরুণদের সমাজ সচেনতার পাশাপাশি চলচ্চিত্র বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহিত না করে বা কোনো সুযোগ সৃষ্টি না করে তাদেরকে

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়া দেখানোতে পারদর্শী করে তুলেছেন। এতে সেইসব তরুণদের সৃজনশীলতার উৎসমুখ যেমন মরে গেছে তেমনি তারা পরিশ্রম বিমুখ হয়ে পড়েছে। প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্য যেখানে অনুচ্চ কণ্ঠে একটু প্রতিবাদই যথেষ্ট সেখানে সৃজনশীলতার দাবি মিটাতে কঠিন পরিশ্রম কে করতে চায়!

১৯৬৮ সালে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট সত্যেন সেন প্রতিষ্ঠা করেন, 'উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী'। সেই সময়ের বিভিন্ন শিল্পী, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও চলচ্চিত্র সংসদ কমিউনিজমের ভাবধারায় পরিচালিত হয়। বেশির ভাগই ছিল সক্রিয় কমিউনিস্ট নতুবা কমিউনিস্ট মতবাদে তাড়িত। 'উদীচী' ছিল তাদের সকল কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা। পরবর্তীতে এদের কেউ কেউ বিদেশের ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে ফিল্ম বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসে। বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন চিত্র, টিভি, রেডিও, পত্র-পত্রিকার সাহিত্য-সংস্কৃতির পাতা এবং বিকল্পধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রকে এরা দখল করে রাখে। আজো অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত কমিউনিজম ভাবধারার ব্যক্তিবর্গ তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তারা নামে মুসলিম হলেও ইসলাম তাদের কাছে অজানা। বরং মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন, ডারউইন তারা যেভাবে আত্মস্থ করেছে, চর্চা করেছে এবং মন-মস্তিষ্কে গেঁথে নিয়েছে সেভাবে তারা কখনো কোরআন পড়েনি, রাসূল [সা]-এর কর্মজীবন পড়েনি বা পড়তে চেষ্টাও করেনি। কমিউনিজম এবং ডারউইনবাদ প্রত্যাখ্যাত হলেও বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা এখনো সেই ব্যর্থ মতবাদে অটল। কারণ এই হতে পারে যে, মানুষের সৃজনশীলতা অদম্য, অটল। তা যখন বন্যার পানির মত বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত হয় তখন পিছন দিকে তার আর সাড় থাকে না। যতক্ষণ না সে সব কিছু ডুবিয়ে ছাড়ে।

মুসলিম নেতৃবর্গ প্রতিভাধর মেধাবী সৃজনশীলদের কোন পথ করে দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ইসলামি নাটক, চলচ্চিত্র বা সামগ্রিক অর্থে সংস্কৃতির বিকাশ সাধিত হয়নি। ইজতিহাদ বা কিয়াসের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন পাঠ শিখানো বা ইমামতি করাটাকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজকে পেশা হিসেবে নেয়াটার বিষয়ে কোন উৎসাহী নির্দেশনা পাওয়া যায়নি বরং পেশাগতভাবে গ্রহণে হতাশ করা হয়।

এদিকে বামধারার সাংস্কৃতিক কর্মীরা যখন নাটক বা চলচ্চিত্র তৈরি করছে তখন তারা তাদের চলচ্চিত্রে কোথাও কোথাও ইসলামকে এমনভাবে পেশ করছে যা আদৌ ইসলাম নয় বা কোথাও কোথাও জেনে বুঝে হেয় করছে

www.pathagar.com

এবং অপমান করছে। তাদের নাটক চলচ্চিত্রে মার্কসীয় ভাবধারা ও আদর্শ প্রকট যা সহজ-সরল মুসলিম তরুণদেরকে মানসিক বিভ্রান্তিতে সহসা লিপ্ত করতে পারে। ওদের মানসিক চিন্তাগত ভিত তৈরি হয়েছে অনৈসলামিকতার উপর। পরবর্তীতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও জাহেলিয়াতের রসে সিক্ত এবং জাহেলিযাতের স্পর্শে পালিত ও লালিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তাই তাদের নির্মিত বিভিন্ন চলচ্চিত্রে তাদের আদর্শের প্রকাশ নির্ভেজাল জাহেলিয়াত এবং কোথাও কোথাও বা মুশরিকি ভাবধারায় উজ্জীবিত।

যেহেতু আমাদের দেশে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র শিক্ষা দেয়া হয় না, তাই যারা হাতে-কলমে চলচ্চিত্র শিখতে চান তারা চলচ্চিত্রের মূলধারা হোক অথবা বিকল্পধারা হোক তার পরিচালকের অধীনে থেকে চলচ্চিত্র শিখতে হয়। [সরকারী এবং ব্যক্তি উদ্যোগে অল্প দু'একটা চলচ্চিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে চলছে]। যাদের মানসিক ভিত্তি, নৈতিক ভিত্তি এবং যাদের কর্মজগতটাই সম্পূর্ণ নির্ভেজাল জাহেলিয়াত তাদের সঙ্গে শিক্ষানবিশি করার কোন প্রকার পরিবেশ পাবে না সম্পূর্ণ ইসলামি আদর্শের ঈমানীশক্তিতে বলিয়ান একজন তরুণ মুসলিম। বরং হয় সে পথভ্রষ্ট হবে নতুবা তিক্তবিরক্ত হয়ে প্রত্যাখ্যান করে চলে আসবে এবং আর শিখতে চাইবে না।

পূর্বে যেসব চলচ্চিত্র আন্দোলনের কথা আমি উল্লেখ করেছি, তাতে চলচ্চিত্র শিক্ষার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উপায় ছিল না। যদিও বর্তমানে বিভিন্ন দেশের স্কুল-কলেজে চলচ্চিত্রকে পাঠ্যক্রম করা হয়েছে।

ফ্রান্সে চলিশের দশকে চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রচলন হয়। ১৯৫০-এ, দু'বছরের পাঠ্যক্রম চালু হয়। ইংল্যান্ডে ১৯৬০ সালে ৭০০ স্কুলে ফিল্ম ও টেলিভিশন শিক্ষা দেয়া হয়। সেখানে চলচ্চিত্র শিক্ষকদের সমিতিও আছে।

আমেরিকায় ক্লাস প্রোজেক্ট হিসেবে ক্লাস সেভেনেই সিনেমা তৈরি করার কাজ শুরু হয়। বর্তমানে আমেরিকায় প্রায় ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। ইংল্যান্ডে অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ১০০। সংস্কৃতির সকল দিকই সন্নিবেশিত হয় ফিল্মে আর ফিল্ম তাই ব্যাপক শক্তিশালী মাধ্যম। ফিল্ম সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে, বলিয়ান করে এবং সর্বোতভাবে সমর্থন জোগায়।

যেহেতু ফিল্ম একটি মাধ্যম-গণমাধ্যম, তাই গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সম্পর্কে তরুণদের সম্যক ধারণা না থাকলে ফিল্মের বৈশিষ্ট্যগুলো

www.pathagar.com

উপলব্ধি করা তরুণদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এর জন্য যে সমাজে তরুণরা বাস করে তার কাঠামো, তার প্রকৃতি, তার চরিত্র সম্পর্কে তরুণদের সন্ধানী প্রশ্ন উত্থাপন করা দরকার। তার উত্তর পাওয়াও জরুরি। অতএব দেখা যাচ্ছে কোনো কার্যকরী চলচ্চিত্র শিক্ষা প্রকল্প এবং তাতে সক্রিয় হওয়ার অর্থ হলো তরুণদের সামাজিক জীবনে দায়িত্বশীল প্রবেশের একটা মহান উদ্যোগের অংশবিশেষ।

যাদের মানসিক ভিত্তি ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কোরআন, হাদীস, ফিকাহ্ শাস্ত্র এবং অন্যান্য ইসলামি সাহিত্য চর্চায় যারা নিবিষ্ট তারাই কেবল চলচ্চিত্র শিক্ষার উপযুক্ত। তাদেরকে প্রথমেই এই সবক নিয়ে আত্মস্ত করা দরকার যে, পৃথিবীর সব মানবিক কল্যাণকে অবজ্ঞা করে শুধু নিজেদেরকে পূজনীয় করে তুলবার জন্য কোন লেখক, কবি, পরিচালক, শিল্পী চলচ্চিত্র শিক্ষা করবে না। নিজেদেরকে পূজা পাবার উপযোগী করে তুলবার জন্য সর্বজনীন মানবিক কল্যাণকে তারা ছুঁড়ে ফেলবে না। ইসলাম যে মানব কল্যাণের দিশা দিয়েছে সেই নীতি ও নৈতিকতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকে দায়িত্বশীল ও যত্নবান হতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিপূজা নয়, আদর্শ প্রতিষ্ঠাই হবে একজন চলচ্চিত্র শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীর মূল বিষয়। অর্থাৎ নিজেকে প্রিয় হিসেবে নয় বরং সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

চলচ্চিত্র শিক্ষার দুটি ধরণ আছে। ১. চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষা। ২. চলচ্চিত্রের কাছ থেকে শিক্ষা।

এই দুই ধরনের ব্যবস্থা করাই একটি চলচ্চিত্র সংগঠনের প্রাথমিক কাজ। একটি কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র শিবিরের অধীনে ছোট ছোট শিবির করে ইসলামি আদর্শের এবং ইসলামি আদর্শের নয় আবার ইসলামি নীতির বিরোধীও নয়, এমন সব ছবি প্রদর্শনী করে তা অনুশীলন করতে পারে। সাহিত্যের পাঠ যেমন ধ্রুপদী সাহিত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তেমনি চলচ্চিত্রের পাঠক্রম মূলত ক্লাসিক ছবিগুলোকে কেন্দ্র করে। তাই এই ধরণের ক্লাসিক ছবি সংগ্রহ করে তা দেখা, শোনা, ভাবনা ও অনুভবের এক বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এবং পোর্টেবল প্রজেক্টরের মাধ্যমে জনসাধারণের সাথে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারে। এতে চলচ্চিত্রের শিক্ষার দুটি প্রাথমিক দিকই কার্যকরী করার সূচনা হতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলচ্চিত্র শিক্ষার এই পদ্ধতিই স্বীকৃত।

চলচ্চিত্র সমাজের স্বীকৃত ভাবনা ও মনোভাবকে প্রাধান্য দিয়েই তাকে বেগবান করে নতুবা বাধার সৃষ্টি করে কিন্তু সে দ্রুত কিছু পালটে দেবার

www.pathagar.com

ক্ষমতা রাখে না বরং যা গ্রহণযোগ্য ছিল না চলচ্চিত্র ধীরে ধীরে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষমতা রাখে। যেমন আমাদের মুসলিম সমাজে বহুকিছু গ্রহণযোগ্য ছিল না, যথা মেয়েদের হাতাকাটা ব্লাউজ, ওড়না বিহীন মহিলা অথবা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম খাওয়া, যুবক-যুবতীর প্রেমলীলা এরকম বহুকিছু। চলচ্চিত্র এইসব বিষয়কে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। আবার এমন অনেক বিষয় আছে যা নিতান্তই ইসলামের মৌলিক বিষয় সেগুলোকে প্রচলনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে। যেমন হাদিসের বাণীকে বাধাগ্রস্ত করে মনীষীদের বাণীর প্রচলন। নামাজ রোজা ছাড়াও ইসলামের বিভিন্ন বিধানকে চেপে বা ঢেকে রেখে [যাকে কুফর বলা হয়] মানব রচিত বিধানের জয়গান গাওয়া ইত্যাদি। অথচ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ইসলামের বিধি-বিধানের সর্বজনীন মানবীয় কল্যাণকে নিজেদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল। তা না করে বরং মুসলিম চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম বিষয়গুলোকে বিকৃত করে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যা আজ ইরান চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করছে।

তথাকথিত আধুনিকতা এবং আমেরিকা ইউরোপীয় সংস্কৃতি একটা নিরেট জাহেলিয়াতীয় মন-মস্তিষ্ক তৈরি করতে সচেষ্ট এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সফলও। ইসলামি সংস্কৃতি ও জীবন-ব্যবস্থার আলোকে চিরন্তন মানবীয় অথবা চির আধুনিক ইসলামি মূল্যবোধকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ওইসব জাহেলিয়াতীয় মন-মস্তিষ্কের অধিকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব। যেমন সম্ভব হয়েছিল অতীতের মুসলিম শাসনের সময়।

অল্পবয়সীরা চলচ্চিত্র, টিভি, নাটক এবং বিজ্ঞাপনচিত্রের অভিনয় শিল্পীদের ও সংগীত শিল্পীদেরকে যে সব কারণে অনুকরণ করে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুসরণের মানসিকতা গঠন করে, সে কারণগুলোর অনুসন্ধান না করেও নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, সে সমস্ত অল্পবয়সীরা যেমন বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হচ্ছে তেমনি ওইসব অভিনয় ও সংগীত শিল্পীরা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ তথা নিজস্ব ব্যক্তি ইমেজ তৈরি করার ক্ষেত্রে অল্পবয়সীদের চিন্তা জগতে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে এমন কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না। প্রকৃত অর্থে তারা ইসলাম তথা শান্তি বিরোধী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে সেই সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার এবং অর্থ-সম্পদ অর্জনের কাজে লিপ্ত। আর তাই তারা শান্তিকামী সমাজ ও মানব কল্যাণের জন্য উপকারী নয়। ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারকারী কখনো সর্বজনীন মানবকল্যাণের জন্য উপকারী হতে পারে না। তাদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আমাদের সমাজে বিশেষ করে অল্পবয়সীদের মধ্যে

www.pathagar.com

জাহেলিয়াতের শিকড় বিস্তার হচ্ছে এবং সেটা ব্যাপক হচ্ছে দ্রুতগতিতে। তাদের কর্মপন্থার বিপরীতে যৌক্তিক এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে শুধুমাত্র মৌখিক বিরুদ্ধাচারণ করার ফলে তারা তাদের বিরোধীতাকারীদেরকে অসামাজিক, অসংস্কৃত, অনাধুনিক, প্রগতির অন্তরায়, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ইত্যাদি বলে প্রকটভাবে শত্রুতা করে মুসলিম সমাজকে বহুধাবিভক্ত করে ফেলেছে।

অতএব ইসলামি দৃষ্টিতে চলচ্চিত্র শিক্ষার্থী এবং আন্দোলনকারীদের সদা-সর্বদা সতর্কতার সঙ্গে ব্যক্তি স্বার্থ না দেখে মানবতার স্বার্থকে ইসলামি আদর্শের পথে নির্ণয় করতে হবে এবং প্রাধান্য দিতে হবে।

চলচ্চিত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রথমে যা দরকার তা হলো উন্নতমানের ইসলামি ভাবধারায় পুষ্ট ছবিকে সহজলভ্য করা। যেমন দি ম্যাসেজ, ওমর মুখতার, বা ম্যাসেঞ্জার ইত্যাদি ছবি, অথবা ইসলামি ভাবধারার নয় কিন্তু ইসলাম বিরোধীও নয় এমন সব ছবি, যেমন অক্টোবর, ব্যাটেলশীপ পোটেমকিন, পথের পাঁচালী, হীরক রাজার দেশে, একদিন প্রতিদিন, বাইসাইকেল থিভ, চিলড্রেন হ্যাভেন বা ফাদার ইত্যাদি। এই সমস্ত ছবির প্রদর্শনী ও অনুশীলন দরকার।

প্রতিটি চলচ্চিত্র শিবিরকে এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। এবং নির্মিত ছবিগুলোর মান উন্নয়নে চলচ্চিত্র শিবিরের ভূমিকা থাকবে নেতৃস্থানীয়। কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র শিবির চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা, প্রচারপত্র, পুস্তিকা, ম্যাগাজিন প্রকাশ করে জনসাধারণের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। তারা বাৎসরিক ইসলামি চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করতে পারে, পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থাও করতে পারে। উন্নত ভিডিও ছবি তৈরির আনুসঙ্গিক টেকনোলজির ব্যবস্থা করতে পারে যাতে কম খরচে চলচ্চিত্র উৎপাদন ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

ভিডিও ক্যামেরা, প্রজেক্টর মেশিন, পর্দা, লাইট, ট্রলি, ক্রেন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এইভাবে একটা চলচ্চিত্র শিক্ষা এবং চলচ্চিত্র আন্দোলন সংগঠিত করা সম্ভব।

চলচ্চিত্র একটা বিরাট ও ব্যাপক গণমাধ্যম, সেহেতু রেডিও, পত্রিকা, বিজ্ঞাপন ও টিভি'র মতো চলচ্চিত্র শিক্ষা একটা মাধ্যম শিক্ষা। এগুলো সবই প্রযুক্তি নির্ভর। একদিকে নির্মাতা অন্যদিকে দর্শক, মাধ্যম হলো চলচ্চিত্র। অতএব মাধ্যম শিক্ষার যাবতীয় উপাদান ও উপকরণ এর সঙ্গে

www.pathagar.com

সম্পৃক্ত হওয়া উচিত। চলচ্চিত্র সব সময় সমাজের ভাষায় কথা বলে। কারণ এটি একটি মাধ্যম। উন্নত দেশে মাধ্যম বিষয়ে নতুন নতুন চিন্তাধারার উদ্ভব হয়। সেখানে মাধ্যম বিষয়ের শিক্ষা প্রাধান্য পায়। বর্তমান পৃথিবীতে 'মাধ্যমের' মাধ্যমে জনগণ তার মানসিক চাহিদা এবং প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। আমেরিকায় মাধ্যমকে রূপ দেয় ভোগপণ্যবাদ। অর্থ ও সংযোগের মধ্যে এই মিলন সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে নিষ্পন্ন হয় ক্লাস ঘরের মাধ্যম যন্ত্রের ব্যবহার থেকে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সংযোগ উপগ্রহের সাহায্য গ্রহণ [টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন ধর্মী শিক্ষানুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার] পর্যন্ত।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্রকে বিভিন্ন রূপে দেখা হয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্র একটি পণ্যদ্রব্য, একটা ভোগ্যবস্তু, যা কোনো দেশের এক অন্যতম বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রি দ্বারা উৎপাদিত।

দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্র হলো আবেগময় অভিজ্ঞতা। একজন নির্মাতার দৃষ্টিতে চলচ্চিত্র একটি সৃষ্টি যা মানুষের চেতনাকে নাড়া দেয়। এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্রকে বিভিন্নভাবে দেখা যেতে পারে। তবে চলচ্চিত্র সব সময় শিল্প নয়, কিন্তু সব সময় তা একটি পণ্যদ্রব্য, একটা অভিজ্ঞতা, একটা পরিবেশ, এটাও মনে রাখতে হবে।

তরুণ জীবনে চলচ্চিত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তাদের মন-মস্তিষ্ক, চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতা, নৈতিকতাকে চলচ্চিত্র হয় সমর্থন করে, শক্তিশালী করে এবং বেগবান করে নতুবা বাধাগ্রস্ত করে। তাই চলচ্চিত্রকে সেই সব বিষয়বস্তুর আঙ্গিকে শিক্ষালাভ করতে হবে যা ইসলাম সমর্থন করে। কারণ প্রমাণিত সত্য হিসেবে ইসলামই নৈতিকতার এবং জ্ঞান বিকাশের একমাত্র মানদণ্ড।

চলচ্চিত্রকে অবজ্ঞা করা এবং উপেক্ষা করা মানে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। পৃথিবীর বৃহত্তর আদর্শিক জনগোষ্ঠী হিসেবে মুসলমানদেরকে তাদেরই আদর্শিক পথে চলচ্চিত্রকে গতিশীল করা একান্ত প্রয়োজন। যাতে তাদের কল্যাণকামী চিন্তা-চিন্তন, সমাজ ও পৃথিবীর পথে তাদের মিশনের স্বরূপ এবং সর্বোপরি তাদের আলোকময় অস্তিত্ব সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ অবহিত হতে পারে।

'ইসলামি চলচ্চিত্র ও নাটক প্রসঙ্গে' শেখ আবুল কাসেম মিঠুনের চিন্তার সারাৎসার ছিলো এরকম–

www.pathagar.com

কোন বিষয়ে ভাসাভাসা জ্ঞান নিয়ে চর্চা করলে সেই বিষয়টি যখন সাংস্কৃতিক বিষয় হয় তখন তা বিকৃত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে কোনভাবেই আপস করা চলবে না। জাতে ওঠার নামে জাহেলিয়াতীয় চাকচিক্যতায় কোনোভাবেই নিজের চোখ ঝলসানো উচিত নয়। অথবা জাহেলিয়াতের কোন নামকরা লোককে কাছে এনে নিজেকে সম্মানিত করে তোলার মিথ্যা ভণ্ডামীতেও যেন নিজেকে নিমগ্ন না করি। রাসূল [সা] বলেছেন, ''যে ব্যক্তি কোন বিদায়াতপন্থী ব্যক্তিকে কোনো সম্মান ও মর্যাদা দান করে সে আসলে ইসলামেরই প্রাসাদ চূর্ণ করিয়া দেবার কাজে সাহায্য করে।'' তাই জাহেলিাতের সিঁড়িতে পা রেখে নিজেকে ভাগ্যবানের বদলে গোনাহগার যে ভাবতে পারে সেইতো ইসলামের প্রাসাদ সুদৃঢ় করে। তাবুক যুদ্ধের হযরত কায়াব ইবনে মালিকের [রা] মত। গাসসান বাদশা রেশমী কাপড়ে মোড়া চিঠিতে লিখেছিল, ''তোমাদের মনিব তোমার ওপর জুলুম করছে, আমার কাছে চলে এসো, তোমাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবো।'' কায়াব [রা] চিঠিখানি আগুনে পুড়িয়ে সিজদায় পড়ে গেলেন। ''ইয়া আল্লাহ আমি কতবড় গোনাহগার, এ কতবড় মসিবত যে আজ কাফেররা আমাকে সম্মান দেবার জন্য ডাকছে।''

আমারা জানি সূর্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমারা ছায়াকে অনুসরণ করি। কিন্তু বিষযটা যদি এমন দৃষ্টিতে আমরা দেখি যে, আমরা ছায়াকে ধরতে চাচ্ছি কিন্তু সে পালিয়ে পালিয়ে আমাদেরকে তার পিছনে ছুটতে বাধ্য করছে। জাহেলিয়াতও তেমনি, একজন মুমিনের কাছে সে ছায়া সমতুল্য। জীবনপাত হয়ে যাবে, ছায়ার পিছনে দৌড়াবার নেশা ফুরাবে না। তাই খাঁটি মুমিন জাহেলিয়াত নামক ছায়ার পিছনে দৌড়ায় না।

মরণের পরে যেনো 'নাম' থাকে মানুষের অন্তরে
বুদ্ধি আর শ্রমের যতো ঘাম সেদিকেই ছুটে মরে
জাহিলী জীবনের এই অন্ধকার
কুল নেই তীর নেই যেনো সীমাহীন চরাচর
প্রতিযোগিতায় মত্ত এতেই
দুনিয়ার ইনসানেজ্জ
জাহিলী জীবনে।

সূর্যের তেজে আমাদের চোখ জ্বলবে গা পুড়বে তবুও আমাদের সাহসী বীরের মত শক্তভাবে সূর্যের দিকে অর্থাৎ সত্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, তখন ছায়া অর্থাৎ জাহেলিয়াত আমাদেরকে অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। সাংস্কৃতিক কর্মীদেরকে চলচ্চিত্র, নাটক, উপন্যাস, গল্প, মিডিয়া যে দিকেই

www.pathagar.com

তার পদচারণা হোকনা কেন তা যেন সত্যের দিকে হয়। ইসলামের দিকে হয়। জাহেলিয়াত নামক ছায়ার পিছনে বোকার মত সে যেন না দৌড়ায়। যেন ছায়া তাকে অনুসরণ করে।

উপরোক্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে চলচ্চিত্রের রূপালি পর্দার সেই জনপ্রিয় নায়ক আলোর পথে এসে কিভাবে নিজেকে আলোকিত করেছিলেন এবং এক সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর জীবন থেকে শেখার ও অনুপ্রেরণার অনেক কিছুই আমাদের জন্য রয়ে গেছে।

চলচ্চিত্র জগতে বিচরণের সময় যে মানুষটির ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন ছিলো সচ্ছল, বিলাসবহুল এবং ঝলমলে বহু বর্ণে বর্ণিল, সেই মানুষটিই চলচ্চিত্র জগত ছেড়ে আসার পর একজন অতি সাধারণ মানুষের মত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হতে বাধ্য হন বাস্তবতার কারণে। তাঁর পরিবার-পরিজনও আর্থিক ও সামাজিক এই বাস্তবতা হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন। আর্থিকভাবে অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্বাহ করলেও তাঁর মনে ছিলো না এতোটুকু কষ্টের বুদবুদ। তাঁর পরিবারের মধ্যেও ছিলো না এ নিয়ে কোনো উদ্বেগ বা কষ্টের উদগিরণ। এ থেকেই প্রমাণ হয়, যদি মানুষের হৃদয়ে সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয় তাহলে দুনিয়ার কোনো কষ্ট কিংবা চাওয়া-পাওয়াই তাঁর কাছে গৌণ হয়ে যায়।

যেমন গৌণ হয়ে গিয়েছিলো শেখ আবুল কাসেমের কাছে। এতো কষ্টের পরও সকল সময় তাঁর মুখে এক ধরনের তৃপ্তির হাসি ও চেহারায় নূরানী উজ্জলতা আমরা লক্ষ্য করতাম। আর বিনয়, নম্রতা ও ভদ্রতা তো ছিলো তাঁর একান্ত নিজস্ব ভূষণ।

চলচ্চিত্র ছাড়ার পর শেখ আবুল কাসেম মিঠুন বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্রের উপপরিচালক হিসাবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেছেন অত্যন্ত যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সাথে।

অবশেষে কর্মরত অবস্থায় তিনি অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করেন ২০১৫ সালের ২৫ মে। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। তিনি স্ত্রী মনিরা পারভীন, দুই মেয়ে সঙ্গীতা ও তরী, মা হাফিজা খাতুনসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন।

তাঁর ইন্তেকালের পর এফডিসির পরিচালক সমিতির সভাপতি দেলোয়ার জাহান ঝন্টু বলেন, 'আমার নির্দেশনায় 'নিঃস্বার্থ' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন মিঠুন। খুব ভালো একজন অভিনেতা। একজন ভালো

www.pathagar.com

কাহিনীকারও হারালাম আমরা। আল্লাহ তাঁকে বেহেশত নছিব করুন।'

আর চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, 'অনেক চলচ্চিত্রে মিঠুন আমার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। আমার বহু চলচ্চিত্রের কাহিনিকার তিনি। তাঁর এই অকাল মৃত্যু আমাকে সত্যিই অনেক কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহ তাঁর আত্মাকে শান্তি দিক এই কামনা করি।'

শেখ আবুল কাসেম মিঠুন আজ আর আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর রেখে যাওয়া কীর্তিগাথা। তাঁর কাজ ও সৃষ্টিই তাঁকে এদেশের মানুষের মাঝে বাঁচিয়ে রাখবে বহুকাল অবধি।

কারণ রূপালি পর্দার এই সোনালি মানুষটিকে কখনোই ভুলবার মতো নয়। ভোলাও সম্ভব নয়। জাতির স্মরণে এবং মননে তিনি ঠিকই জাগরিত থাকবেন। উচ্চারিত হতে থাকবেন বারবার। আখেরাতেও যথাযথ মর্যাদা পাবেন ইনশাআল্লাহ। এটাইতো বোধ করি শেখ আবুল কাসেমের চূড়ান্ত সফলতা!

www.pathagar.com

তাঁর সাহিত্যের যাত্রা শুরু সেই কৈশোরে। পিতা ছিলেন তাঁর আগ্রহী পাঠক। পিতার অকৃপণ উদারতা এবং প্রশ্রয়ে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছেন তিনি শব্দের সমুদ্র বেয়ে। সেইতো শুরু। তারপর পাথর কেটে কেটে, রক্তনদী পার হয়ে, বন্ধুর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আজ তিনি উপস্থিত হয়েছেন সাহিত্যের এই কূল-সীমানায়।

কর্মজীবনও তাঁর সাহিত্যের মত বৈচিত্র্যময়। শিক্ষকতা, সম্পাদনা ও সাংবাদিকতা দিয়ে শুরু হয়েছিল কর্মজীবনের পথ চলা। বহু বাঁক পেরিয়ে এখনো তিনি পেশায় একজন সম্পাদক। লেখাটাকেও তিনি পেশার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এক সময় মেতে ছিলেন যশোরে, সাহিত্য সংগঠন এবং সাহিত্যের কাগজ নিয়ে। দাবানল, প্রস্তুতি, সাপ্তাহিক মুজাহিদের সাহিত্য বিভাগ এবং নবীনের মাহফিল সম্পাদনা ছাড়াও বিভিন্ন সাহিত্য কর্মে ছিলেন সদা ব্যস্ত। ১৯৮৫ সালে ঢাকায় পাড়ি জমাবার পর রাজধানীর বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের সাথে গড়ে ওঠে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। এখনো তিনি বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি সংস্থা এবং সাহিত্য আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের ভেতর রয়েছে কাব্যগ্রন্থ, কাব্যসমগ্র, কিশোর উপন্যাসসমগ্র, কিশোর গল্পসমগ্র, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান প্রভৃতি।

তাঁর কবিতা ইংরেজি, রুশ, আরবী, উর্দু, হিন্দী, ফারসী, গুজরাটিসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

তিনি এ পর্যন্ত অনেক পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

পুরস্কার কিংবা সম্বর্ধনাই কেবল সাহিত্যের চূড়ান্ত মাপকাঠি নয়। সাহিত্যের মানদণ্ড–শেষ পর্যন্ত সফল সৃষ্টি। এদিক থেকে বিবেচনা করলে মোশাররফ হোসেন খান যথার্থই একজন সফল এবং স্বার্থক কবি।

মোশাররফ হোসেন খানের নামটি উচ্চারণ করতেই এখন আমাদের সম্মুখে ভেসে ওঠে এই সময়ের একজন দীপ্যমান শ্রেষ্ঠ কবির রৌদ্রকরোজ্জ্বল অবয়ব।

বস্তুত ক্রমবর্ধমান–সদাচলিষ্ণু বেগবান এক দুঃসাহসী কবির নাম–মোশাররফ হোসেন খান।

প্রচ্ছদঃ মোজাম্মেল প্রধান

www.pathagar.com

Songskritir Tin Nokib
by Mosharraf Hossain Khan
Published by Pidim Prokashon
Published on October 2016
Price: BD Tk. 120/- Only

পিদিম
প্রকাশন